সালাত (নামাজ) কেন আ জব্যর্থ হচ্ছে

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান
F.R.C.S (Glasgow)
চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বিভাগীয় প্রধান, সার্জারী বিভাগ
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল কমপ্লেক্স

১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি

মগবাজার, রমনা, ঢাকা।

ফোনঃ ০২-৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯-৪৭৪৬১৭, ০১৯৭৯-৪৬৪৭১৭

E-mail: qrfbd2012@gmail.com

www.qrfbd.org

প্রকাশকাল

প্রথম মুদ্রণ : মার্চ ১৯৯৯

৯ম সংস্করণ : মার্চ ২০১২

১০ম সংস্করণ : জুন ২০১৭

কম্পিউটার কম্পোজ

Q R F

মূল্য : **৭২** টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই

অথেন্টিক প্রিন্টার্স

২১৭/৩, ১নং গলি, ফকিরাপুল

মতিঝিল, ঢাকা

মোবাইল: ০২-৭১৯২৫৩৯

সূচীপত্র

ক্রম.	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	চিকিৎসক হয়েও কেন এ বিষয়ে কলম ধরলাম	০৬
২.	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৩.	আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা	২০
৪.	মূল বিষয়	২১
৫.	পুস্তিকার নামকরণের যথার্থতা	২১
৬.	সালাতের গুরুত্ব	২২
৭.	সালাত ব্যর্থ হওয়ার প্রধানতম কারণ	২২
৮.	'আকিমুস্ সালাত' কথাটির প্রচলিত অর্থ	২৩
৯.	'আকিমুস্ সালাত' কথাটির প্রকৃত অর্থ	২৩
১০.	আল কুরআন থেকে কোন বিষয়ের তথ্য খুজে পাওয়ার পূর্বশর্ত	২৪
১১.	সালাতের শিক্ষাসমূহের শিরোনাম	৩৫
১২.	প্রধান শিক্ষাসমূহ সালাত থেকে যে পদ্ধতিতে দেয়া হয়েছে	৩৬
১৩.	ব্যক্তি জীবনের প্রধান শিক্ষাগুলো তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকভাবে সালাত থেকে যেভাবে দেয়া হয়েছে	৩৬
১৪.	সমাজ জীবনের প্রধান শিক্ষাগুলো তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ভাবে সালাত থেকে যেভাবে দেয়া হয়েছে	৪৪
১৫.	সালাতের পঠিত বিষয় থেকে শিক্ষা	৭০
	▪ সূরা ফাতেহা পড়া থেকে শিক্ষা	৭১
	▪ কুরআনের অন্য আয়াতসমূহ পড়া থেকে শিক্ষা	৭৬
	▪ তাসবীহ পড়া থেকে শিক্ষা	৭৯
	▪ দোয়া থেকে শিক্ষা	৮২
১৬.	সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী নামক উপাসনামূলক ইবাদাতগুলো এবং মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের মধ্যে সম্পর্ক	৮২
১৭.	আনুষ্ঠানিক উপাসনাগুলোর মধ্যে সালাতকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়ার কারণ	৮৪
১৮.	সালাত এবং রাসূল (সা.), সাহাবায়ে কিরাম ও ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের ব্যক্তি ও সামাজিক অবস্থা	৮৪
১৯.	সালাত কবুল হওয়ার সার্বিক শর্তসমূহ	৮৪
২০.	শেষ কথা	৮৫

আলোচ্য বিষয়ের সারসংক্ষেপ

সালাত ইসলামের অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরজ বা মৌলিক আমল। আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের মধ্যে এটি সবচেয়ে বেশী পালন করা হয়। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো সালাত সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের সহজবোধগম্য তথ্য এবং বর্তমান মুসলিম জাতির জ্ঞান ও আমলের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। আরব এবং আরবী ভাষা ও গ্রামার জানা আনারবসহ কোটি কোটি মুসলিম বর্তমান বিশ্বে উপস্থিত আছে। কিন্তু কেন তারা কুরআনে থাকা সালাত বিষয়ক বিশেষ করে 'আকিমুস্ সালাত' বিষয়ক তথ্যগুলো বুঝতে পারছে না এটি অবাক করার মত একটি ব্যাপার। আর এ কারণে সালাত পালনের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে যে কল্যাণ পাওয়ার কথা ছিল মুসলিম জাতি তা পাচ্ছে না। এর ফলস্বরূপ পরকালে বর্তমান মুসলিমদের কি অবস্থা হবে তা অনুমান করা খুব কঠিন নয়। পুস্তিকাটিতে কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর তথ্যের মাধ্যমে সালাত বিষয়ক অতীব গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো মুসলিম জাতির সামনে উপস্থাপন করা হবে। এটি মুসলিমদের সালাত বিষয়ক জ্ঞানকে শুধরিয়ে নিতে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সালাতের কল্যাণ পাওয়ার ব্যাপারে দারুণভাবে সহায়ক হবে ইনশাআল্লাহ।

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হলো তিনটি- কুরআন, সুন্নাহ এবং Common sense। কুরআন হলো আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান। সুন্নাহ হলো আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে এটি আল্লাহ প্রদত্ত মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা। আর Common sense হলো আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান। কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে এ তিনটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুস্তিকাটির জন্য এই তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক।

ক. আল কুরআন

কোনো কিছু পরিচালনার বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হলো সেটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দিয়েছেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মূল বিষয় ও কিছু আনুসঙ্গিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেনো ঐ যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল (আসমানী কিতাব) সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। ঐ আসমানী কিতাবে আছে তাদের জীবন পরিচালনার সকল মূল বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়), অধিকাংশ দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয় (প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়) এবং কিছু অমৌলিক বিষয়।

এটা আল্লাহ এজন্য করেছেন যে, মানুষ যেনো তাদের জীবন পরিচালনার মূল বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিলো যে, রাসূল মুহাম্মদ (সা.) এর পর আর কোনো নবী-রাসূল (আ.) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই, তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল কুরআনের তথ্যগুলো যাতে রাসূল (সা.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পরও সময়ের বিবর্তনে মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোনো কমবেশি না হয়ে যায়, সেজন্য কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূল (সা.)-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মূল বা প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হলো, সবক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কোনো বিষয়ের একটা দিক

এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যই কুরআন নিজে এবং ইমাম ইবনে তাইমিয়া, ইমাম ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন-'কুরআন তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করা।'

(গোলাম আহমাদ বাররী, তারীখে তাফসীর, পৃষ্ঠা- ১৩৮)

তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেনো অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নিসার ৮২নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন- কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোনো কথা নেই। বর্তমান পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

খ. সুন্নাহ (হাদীস)

সুন্নাহ হলো কুরআনের বক্তব্যের বাস্তব রূপ বা ব্যাখ্যা। আর এ ব্যাখ্যা করেছেন আল্লাহর নিয়োগপ্রাপ্ত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী রাসূল মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে। রাসূল (সা.) নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন করার সময় আল্লাহ তা,য়ালার অনুমতি ছাড়া কোনো কথা, কাজ বা সমর্থন করতেন না। তাই সুন্নাহও প্রমাণিত জ্ঞান। কুরআন দ্বারা যদি কোনো বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায় তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। ব্যাখ্যা মূল বক্তব্যের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হয়, কখনও বিরোধী হয়না। তাই সুন্নাহ কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে। কখনও বিরোধী হবেনা। এ কথাটি আল্লাহ তা,য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন সূরা আল হাক্কাহ এর ৪৪-৪৭ নং আয়াতের মাধ্যমে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ

অনুবাদঃ আর সে যদি আমার বিষয়ে কোনো কথা বানিয়ে বলতো। অবশ্যই আমরা তাকে ডান হাতে (শক্ত করে) ধরে ফেলতাম। অত:পর অবশ্যই আমরা তার জীবন-ধমনী কেটে দিতাম। অত:পর তোমাদের মধ্যে কেউই নেই যে তা থেকে আমাকে বিরত করতে পারতে।

(আল হাক্কাহ/৬৯: ৪৪-৪৭)

একটি বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যাখ্যাকারীকে কোনো কোনো সময় এমন কথা বলতে হয় যা মূল বিষয়ের অতিরিক্ত। কিন্তু তা মূল বিষয়ের বিরোধী নয়। তাই কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে যেয়ে রাসূল (সা.) এমন কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা কুরআনের বিষয়ের বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

হাদীস থেকেও কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে ঐ বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসকে যেন দুর্বল হাদীস রহিত (Cancel) করে না দেয়। হাদীসকে পুস্তিকার তথ্যের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হিসেবে ধরা হয়েছে।

গ. Common sense

কুরআন ও সুন্নাহ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস তথ্যটি প্রায় সকল মুসলিম জানে ও মানে। কিন্তু Common sense যে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের একটি উৎস এ তথ্যটি বর্তমান মুসলিম উম্মাহ একেবারে হারিয়ে ফেলেছে। Common sense নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'Common sense-এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেনো'** নামক পুস্তিকাটিতে। তবে Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব ইত্যাদি দিক সম্পর্কিত বাস্তবতা, কুরআন ও হাদীসের কিছু তথ্য নিম্নে তুলে ধরা হলো। তথ্যগুলো পৃথিবীর সকল মানুষ বিশেষ করে মুসলিমদের জানা ও মানা দরকার।

বাস্তবতা

মানুষের জীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের জন্য কোনটি উপকারী (সঠিক) এবং কোনটি ক্ষতিকর (ভুল বা রোগসৃষ্টিকারী) তা পার্থক্য করতে পারা এবং উপকারী জিনিস শরীরে ঢুকতে দেয়া ও ক্ষতিকর জিনিস ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য রোগপ্রতিরোধ ব্যবসহা (Immunological System) নামের মহাকল্যাণকর এক দারোয়ান আল্লাহ সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। মানুষের জীবন শান্তিময় হওয়ার জন্য সঠিক জ্ঞান ও ভুল জ্ঞান পার্থক্য করতে পারা এবং জ্ঞানের রাজ্যে সঠিক জ্ঞান ঢুকতে দেয়া ও ভুল জ্ঞান ঢোকা প্রতিরোধ করতে পারার বিষয়টিও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ রোগ প্রতিরোধ ব্যবসহা নামের মহাকল্যাণকর এক দারোয়ান সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। তাই সহজে বলা যায়, সঠিক জ্ঞান ও ভুল জ্ঞান পার্থক্য করতে পারা এবং জ্ঞানের রাজ্যে সঠিক জ্ঞান ঢুকতে দেয়া ও ভুল জ্ঞান ঢোকা প্রতিরোধ করতে পারার জন্য কোনো একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান জন্মগতভাবে সকল মানুষকে মহান আল্লাহর দেয়ার কথা। বাস্তবে আল্লাহ তা,য়ালা সকল মানুষকে তা দিয়েছেন। সে দারোয়ান হলো বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান।

কুরআন

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۝ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ۝ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ؕ

অনুবাদ: কসম মনের (অন্তর/Mind) এবং তাঁর যিনি তাকে সঠিকভাবে গঠন করেছেন। অত:পর তাকে (মনকে) 'ইলহাম' করেছেন তার অন্যায় (ভুল) ও ন্যায় (সঠিক), (পার্থক্য করার শক্তি)। অবশ্যই সে সফল হবে যে তাকে (ঐ শক্তিকে)

উৎকর্ষিত করবে। আর অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে তাকে (ঐ শক্তিকে) অবদমিত করবে।

(আশ্-শামস/৯১ : ৭, ৮)

ব্যাখ্যা: ভুল ও সঠিক পার্থক্য করার শক্তি হলো 'জ্ঞানের শক্তি'। মহান আল্লাহ মানুষকে জন্মগতভাবে দু'টি শক্তি দিয়েছেন-জীবনী শক্তি ও জ্ঞানের শক্তি। জীবনী শক্তি দেয়ার আল্লাহর পদ্ধতি হলো 'ফুঁক', যা তিনি জানিয়েছেন সূরা হিজরের ২৯ নং আয়াতে-

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

অনুবাদ: যখন আমি তাকে বিন্যস্ত করবো এবং আমার রূহ থেকে কিছু তাকে ফুঁকে দেবো তখন তোমরা তাঁর প্রতি সিজদাবনত হবে।

(হিজর/১৫: ২৯)

অন্যদিকে মানুষকে জ্ঞানের শক্তি দেয়ার আল্লাহর পদ্ধতি হলো 'ইলহাম'। যা তিনি জানিয়েছেন সূরা শামসের ৭ ও ৮ নং আয়াতের মধ্যে।

তাই, সূরা শামসের ৮নং আয়াতখানিতে মহান আল্লাহ বলেছেন- তিনি জন্মগত-ভাবে 'ইলহাম'-এর মাধ্যমে মানুষকে জ্ঞানের শক্তি দিয়েছেন। জন্মগতভাবে লাভ করা এই জ্ঞানের শক্তিকে বোধশক্তি, বিবেক, Common sense, আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান বা **عقل** বলে। এ কথাটি যে সত্য, তা আমরা সকলেই অনুভব করি।

অন্যদিকে, সূরা শামসের ৯ ও ১০ নং আয়াত থেকে জানা যায় জন্মগতভাবে লাভ করা এই শক্তিটি উৎকর্ষিত বা অবদমিত হতে পারে। তাই Common sense এর তথ্য সঠিক ও ভুল উভয়টি হতে পারে। তাই Common sense এর তথ্য অপ্রমাণিত (সাধারণ)।

হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىَ فِيْ 'مُسْنَدِهِ' حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ وَابِصَةَ بْنَ مَعْبَدٍ صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: جِئْتُ إِلَى رَسُولِ ﷺ أَسْأَلُهُ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، فَقَالَ: جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ، وَالْإِثْمِ. فَقُلْتُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ أَسْأَلُكَ عَنْ

غَيْرِهِ، فَقَالَ: الْبِرُّ مَا انْشَرَحَ لَهُ صَدْرُكَ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَإِنْ أَفْتَاكَ عَنْهُ النَّاسُ.

অনুবাদঃ *ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.), আবূ আবদুল্লাহ আস-সুলামী (রা.)-এর বলা বর্ণনা, সনদের ৪র্থ ব্যক্তি আবদুর রহমান বিন মাহদী থেকে শুনে তাঁর হাদীস গ্রন্থে লিখেছেন-* আবূ আবদুল্লাহ আস-সুলামী (রা.) বলেন, আমি রসূল (সা.)-এর সাহাবী ওয়াবেসাকে (রা.) বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন যে, আমি রসূল (সা.)-এর নিকট নেকী ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে আসলাম। তখন রসূল (সা.) বললেন, তুমি কি নেকী ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? তখন আমি বললাম: আপনাকে যিনি সত্যসহ নবী হিসেবে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন তার শপথ করে বলছি, আমি এটি ভিন্ন অন্য কিছু জিজ্ঞেস করতে আসিনি। তখন রসূল (সা.) বললেন, নেকী হল সেটি যা দ্বারা তোমার **ছদর** স্বস্তি/প্রশান্তি লাভ করে। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার **ছদরে** সন্দেহ/ সংশয়/অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও মানুষ তোমাকে সে বিষয়ে ফতোয়া দেয়।

- *হাদীসটি সনদ ও মতন সহীহ*
- *মুসনাদে আহমাদ, আবূ আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ-শায়বানী, (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০১২ খ্রী.)* مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ *(সিরিয়ান সাহাবীদের হাদীস)* حَدِيثُ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْأَسَدِيِّ نَزَلَ الرَّقَّةَ *(ওয়াবেসা বিন মা,বাদ আল-আসাদী-এর হাদীস), ১০ম খণ্ড, হাদীস নং ১৭৯২২, পৃ. ৫৬৩।*

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীসখানিসহ অন্যান্য হাদীস থেকে জানা যায়- মানুষের মনে একটি শক্তি আছে যা বুঝতে পারে কোনোটি সঠিক ও কোনোটি ভুল। মানুষের মনের ঐ শক্তিকে বোধশক্তি, Common sense,عَقْلٌ বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান বলে।

হাদীসখানির শেষে 'যদিও মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়' কথাটির মাধ্যমে রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন, কোনো মানুষ যদি এমন কথা বলে যাতে মন সায় দেয় না, তবে বিনা যাচাইয়ে তা মেনে নেয়া যাবে না। সে ব্যক্তি যত বড় মুফাসসির, মুহাদ্দিস, মুফতি, প্রফেসর, চিকিৎসক বা ইঞ্জিনিয়ার হোক না কেনো।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ 'مُسْنَدِهِ' حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟

অনুবাদঃ *ইমাম আহমদ (রহ.), আবু হুরায়রা (রা.)-এর বলা বর্ণনা, সনদের ৫ম ব্যক্তি আব্দুল আলা থেকে শুনে তাঁর হাদিস গ্রন্থে লিখেছেন-* আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, প্রতিটি শিশুই মানব প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইয়াহুদী, খ্রিস্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে। যেমন, চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক, কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে। অনুরূপ ইসলামের ফিতরাতে ভূমিষ্ট সন্তানকে মা-বাবা তাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবন ধারায় প্রবাহিত করে ভ্রান্তধর্মী বানিয়ে ফেলে)

ব্যাখ্যাঃ এ হাদীসখানি থেকে জানা যায় যে, শিক্ষা ও পরিবেশের প্রভাবে Common sense পরিবর্তীত হয়ে যায়। অর্থাৎ ইসলামের বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের প্রভাবে Common sense অবদমিত হয়। আর ইসলামের সম্পূরক শিক্ষা ও অনুকূল পরিবেশের প্রভাবে Common sense উৎকর্ষিত হয়।

- *হাদীসটি সনদ ও মতন সহীহ*
- *মুসনাদে আহমাদ, আবূ আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল আশ-শায়বানী, (কায়রো: দারুল হাদীস, ২০১২ খ্রী.) مُسْنَدُ الْمُكْثِرِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ (সিরিয়ান সাহাবীদের হাদিস) مُسْنَدُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (ওয়াবেসা বিন মা,বাদ আল-আসাদী'র হাদিস), ৫ম খণ্ড, হাদীস নং ৭১৮১, পৃ. ৪২৪।*

ব্যাখ্যা: এ হাদীসখানিসহ আরো হাদীস থেকে জানা যায়, মা-বাবা তথা শিক্ষা ও পরিবেশ মানব শিশুকে ইসলামী প্রকৃতি থেকে সরিয়ে ইহুদী, ঈসায়ী বা মজুসী তথা অন্য ধর্ম-বিশ্বাসের অনুসারী বানিয়ে দেয়। অর্থাৎ শিক্ষা ও পরিবেশের কারণে মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি Common sense অবদমিত বা পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাই সে অন্য ধর্ম-বিশ্বাসের অনুসারী হয়ে যায়।

তাই, কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায় এবং সাধারণভাবে আমরা সকলেই জানি- পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা Common sense পরিবর্তিত হয়। আর তাই Common sense বিরোধী কথা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে কুরআন ও প্রয়োজন হলে হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে। আবার Common sense সিদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করার আগে কুরআন ও প্রয়োজন হলে হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

Common sense এর গুরুত্ব

Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার করার গুরুত্ব কি পরিমাণ তা মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

তথ্য - ১

إِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ

অনুবাদঃ নিশ্চয় আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির, বোবা যারা Common sense কে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা: যারা Common sense –কে যথাযথভাবে কাজে লাগায় না তাদেরকে নিকৃষ্টতম জীব বলার কারণ হলো- একটি হিংস্র জীব ২-৪ জনের বেশী মানুষের ক্ষতি করতে পারেনা। মানুষ সেটিকে মেরে ফেলে। কিন্তু Common sense-কে যথাযথভাবে কাজে না লাগানো একজন মানুষ (Non-sense মানুষ) লক্ষ লক্ষ মানুষের ক্ষতি করতে পারে।

তথ্য - ২

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ.

অনুবাদ: আর যারা Common sense কে কাজে লাগায় না তাদের ওপর তিনি ভুল চাপিয়ে দেন (ভুল চেপে বসে)।

(ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মানুষ যদি কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করে তবে আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী তাদের ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে।

তথ্য - ৩

وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ

অনুবাদ: তারা আরো বলবে- যদি আমরা (সতর্ককারীদের কথা তথা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনতাম অথবা Common sense কে ব্যবহার করতাম তাহলে আজ আমাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না।

(মূলক/৬৭ : ১০)

ব্যাখ্যা: আয়াতটিতে শেষ বিচার দিনে জাহান্নামের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যেসব কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে- যদি তারা কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শুনতো অথবা ইসলাম জানার জন্য Common sense কে যথাযথভাবে ব্যবহার করতো, তবে তাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না। কারণ, Common sense কে কুরআন ও সুন্নাহর সাথে যথাযথভাবে ব্যবহার করলে তারা জীবন সম্পর্কিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করতে পারতো। আর সহজেই বুঝতে পারতো যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর সকল কথা Common sense সম্মত। ফলে তারা তা সহজে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে পারতো এবং তাদের জাহান্নামে যেতে হতো না। আয়াতখানি থেকে তাই বুঝা যায়, কুরআন ও সুন্নাহর সাথে Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা জাহান্নামে যাওয়ার একটা কারণ হবে।

তাই, Common sense-এর রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি সাধারণ (অপ্রমাণিত) উৎস হিসেবে নেয়া হয়েছে। তবে Common sense ব্যবহারের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে-

ক. Common sense বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের দ্বারা অধঃপতিত হয়, তবে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না

খ. সঠিক বা সম্পূরক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে Common sense উৎকর্ষিত হয়ে কুরআন-সুন্নাহর কাছাকাছি পৌঁছে যায় কিন্তু একেবারে সমান হয়না

গ. মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী কুরআন এর কোনো বক্তব্য যদি বুঝা না যায় তবুও তাকে সত্য বলে নি:সন্দেহে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানুষের জ্ঞান একটি বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত কুরআনের কোনো কোনো আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝে নাও আসতে পারে। আর এ কারণেই আল্লাহ Common sense এর ব্যবহার এবং কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করাকে কোনো বিশেষ কালের মানুষের জন্য নির্দিষ্ট করে দেননি। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে বলে আশা করি-

১. অল্প সময়ে রকেটে করে গ্রহ-উপগ্রহে পৌঁছার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর রাসূলের (সা.) মে'রাজ বুঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে।

২. সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন- দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ সৎ কাজ করলে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন দেখানো হবে, আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (VIDEO recording) এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার পূর্ব পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই 'কাজ দেখানো' শব্দটি সঠিকভাবে বুঝা সম্ভব ছিলো না। তাই পুরাতন তাফসীরগুলোতে এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি, মানুষের ২৪ ঘণ্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাঁর ফেরেশতা (রেকর্ডিং কর্মচারী) দিয়ে ভিডিও রেকর্ডের মত রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিস্ক (Computer disk) বা তার চেয়েও উন্নত কোনো পদ্ধতিতে সংরক্ষিত রাখছেন। শেষ বিচারের দিন এ রেকর্ড তথ্য-প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা হবে।

৩. মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর (Developmental steps) সম্বন্ধে কুরআনের যে সকল আয়াত আছে, আগের মোফাসসিরগণের পক্ষে তার সঠিক তাফসীর করা সম্ভব হয়নি। আর এর কারণ হলো বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তর পর্যন্ত না পৌঁছানো। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের বৃদ্ধির (Embryological development) জ্ঞান যতই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

জ্ঞান বৃদ্ধি পাওয়া এবং উৎকর্ষিত হওয়ার কারণে পরের যুগের যোগ্য মানুষদের কুরআন ও সুন্নাহ অধিক ভালো বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারার বিষয়টি রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে-

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ البخاري رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ فِيْ صَحِيْحِهِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ

أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَرَجُلٌ أَفْضَلُ فِي نَفْسِي مِنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ ... ... أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ... ... ...

অনুবাদ: *ইমাম বুখারী (রহ.), আবু বাকরা (রা.) এর বলা বর্ণনা, সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ থেকে শুনে তাঁর হাদীসগ্রন্থে লিখেছেন-* আবূ বাকরা (রা.) বলেন, কুরবানীর দিন নবী (সা.) আমাদের খুৎবা দিলেন এবং বললেনঃ ... ... সাবধান! আমি কি তোমাদের নিকট পৌঁছায়েছি (রিসালাতের বাণী)? তারা (সাহাবীগণ) বললেন, হ্যাঁ। (অত:পর) তিনি বললেন- হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাকো। অত:পর উপস্থিতরা যেন অনুপস্থিতদের নিকট আমার এ বক্তব্য পৌঁছে দেয়। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে যার নিকট পৌঁছানো হয় সে শ্রোতা অপেক্ষা অধিক অনুধাবন, ব্যাখ্যা ও সংরক্ষণকারী হয় ... ...।

- *হাদীসটি সনদ ও মতন সহীহ*
- *সহীহুল বুখারী, আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইসমা'ঈল আল-বুখারী (আল-কাহিরাহ: মাকতাবাতুস্ সফা, ২০১৩ খ্রী.),كِتَابُ الحَجِّ (হজ্জ অধ্যায়), بَابُ الخُطْبَةِ أَيَّامَ مِنًى (মিনা দিবসে খুৎবা প্রদান পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ১৭৪১, পৃ. ২০৮।*

হাদীস-২

أخرج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في 'سننه' حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ نِصْفَ النَّهَارِ، قُلْنَا: مَا بَعَثَ إِلَيْهِ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا لِشَيْءٍ يَسْأَلُهُ عَنْهُ، فَقُمْنَا فَسَأَلْنَاهُ، فَقَالَ: نَعَمْ، سَأَلَنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، سَمِعْتُ رَسُولَ ﷺ يَقُولُ: نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ.

অনুবাদঃ *ইমাম তিরমিযী (রহ.), যাইদ ইবনু সাবিত (রা.) -এর বলা বর্ণনা, সনদের ৭ম ব্যক্তি মাহমূদ বিন গাইলান থেকে শুনে তাঁর হাদীস গ্রন্থে লিখেছেন-* সনদের ২য় ব্যক্তি আবান ইবনু ওসমান (রহ) বলেন, কোনো একদিন যাইদ ইবনু সাবিত (রা.) ঠিক দুপুরের সময় মারওয়ানের নিকট হতে বেরিয়ে আসলেন। আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলাম, সম্ভবতঃ কোনো ব্যাপারে প্রশ্ন করার জন্যই এ সময়ে মারওয়ান তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সুতরাং আমরা উঠে গিয়ে তাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি আমার কাছে কয়েকটি কথা জিজ্ঞেস করেছেন, যা আমি রসূলুল্লাহ (সা.) -এর নিকট শুনেছি। আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-কে বলতে শুনেছি- আল্লাহ তা,আলা সেই ব্যক্তির চেহারা আনন্দ- উজ্জ্বল করুন, যে আমার একটি কথা (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য) শুনেছে, তারপর তা স্মরন রেখেছে, অন্যের নিকট পৌঁছে দিয়েছে। কেননা, অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজের তুলনায় অধিক জ্ঞানের অধিকারীর নিকট জ্ঞান পৌঁছে দেয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞানের বাহক নিজে জ্ঞানী নয়।

- *হাদীসটি সনদ ও মতন সহীহ*
- *সুনানুত তিরমিযী, আবূ ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা বিন সাওরাহ আত-তিরমিযী (মিসর: দারুল মাওয়াদ্দাহ, ২০১৩ খ্রী.), أَبْوَابُ الْعِلْمِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (রসূলুল্লাহ সা. থেকে জ্ঞান অধ্যায়), بَابُ مَا جَاءَ فِي الْحَثِّ عَلَى تَبْلِيغِ السَّمَاعِ (শ্রুত জ্ঞান প্রচারে অনুপ্রেরণা দেয়া পরিচ্ছেদ), হাদীস নং ২৬৫৬, পৃ. ৪৭১।*

বিজ্ঞান

মানব সভ্যতার বর্তমান স্তরে `বিজ্ঞান, যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে আমার মনে হয়না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense এর বিরাট ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন আপেলটি উপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেনো? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense এর এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। তাহলে দেখা যায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense এর ন্যায় বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর আলোকে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি নির্ভুল হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য একই হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে-

سَنُرِيْهِمْ اٰيٰتِنَا فِى الْاٰفَاقِ وَفِىْٓ اَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقُّ ؕ اَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ شَهِيْدٌ.

অনুবাদঃ শীঘ্রই আমরা তাদেরকে (অতাৎক্ষণিকভাবে) দিগন্তে এবং নিজেদের (শরীরের) মধ্যে থাকা আমাদের নিদর্শনাবলি (উদাহরণ) দেখাতে থাকবো,

যতক্ষণ না তাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে তা (কুরআনের সকল বক্তব্য) সত্য। (হা-মিম-আস-সিজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা: দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অনুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদুর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা,য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ হলো- প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই, এ আয়াতে যা বলা হয়েছে- খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদুর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সত্য প্রমাণিত হবে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য একই হবে।

কিয়াস ও ইজমা

কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক অর্থবোধক বা কুরআন ও সুন্নাহ-এ উল্লেখ নেই এমন বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর অন্য তথ্য এবং Common sense– এর আলোকে ইসলামের যে কোনো যুগের একজন জ্ঞানী ব্যক্তির গবেষণার ফলকে ‘কিয়াস’ বলে। আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফলাফল এক হওয়া অথবা কারো কিয়াসের ব্যাপারে সকলের একমত হওয়াকে ‘ইজমা’ (Concensus) বলে। তাই সহজে বুঝা যায়- কিয়াস বা ইজমা আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস নয়। কিয়াস ও ইজমা হলো আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি (কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense) ব্যবহার করে একটি বিষয়ে যে কোনো যুগের জ্ঞানী ব্যক্তির একক বা সামষ্টিক গবেষণার ফল। গবেষণার ফল কখনো উৎস হতে পারেনা। গবেষণার ফল হবে সূত্র বা রিফারেন্স। তাই কিয়াস ও ইজমা উৎস হবেনা। কিয়াস ও ইজমা হবে সূত্র বা রিফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন

ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যে কোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এ ব্যাপারে কিয়াস করার সুযোগ নেই।

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের নীতিমালা (প্রবাহচিত্র)

যেকোনো বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন বা সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহারের নীতিমালাটি (প্রবাহচিত্র) মহান আল্লাহ সার সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং এবং সূরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭নং আয়াতসহ আরো আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা (রা.)-এর চরিত্র নিয়ে ছড়ানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রাসূল (সা.) নীতিমালাটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। নীতিমালাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞান অর্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের নীতিমালা (প্রবাহচিত্র)' নামক বইটিতে। প্রবাহ চিত্রটি এখানে উপস্থাপন করা হলো-

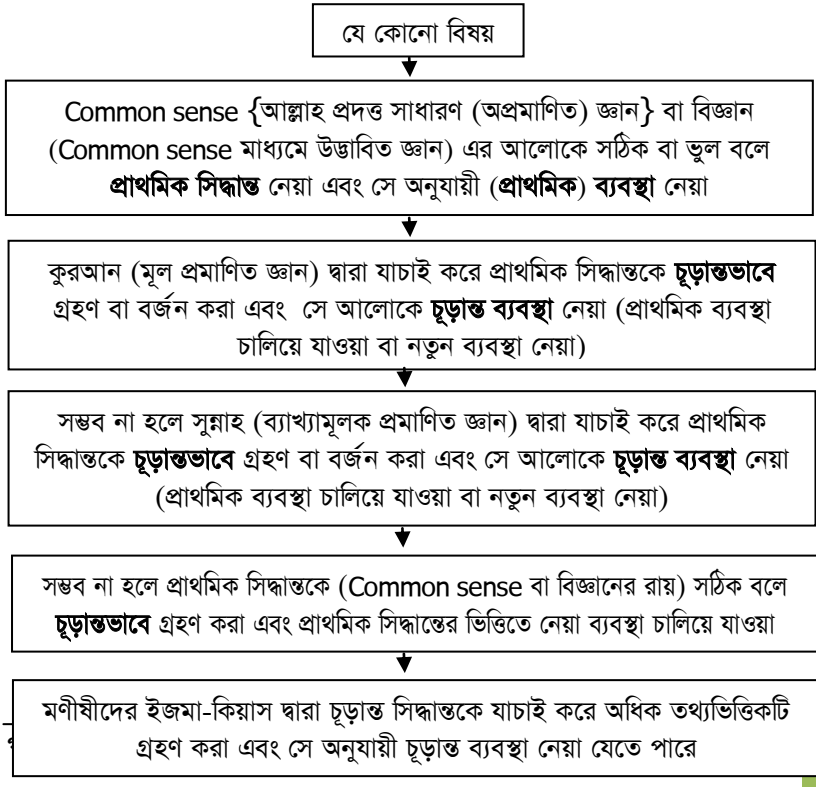

মূল বিষয়

সালাত ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরজ বা মৌলিক আমল। ইসলামের আনুষ্ঠানিক আমলের মধ্যে এটি সবচেয়ে বেশি পালন করা হয়। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় সালাত সম্পর্কে কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর তথ্য এবং বর্তমান মুসলিম জাতির জ্ঞান ও আমলের মধ্যে ব্যাপাক পার্থক্য বিদ্যমান। পুস্তিকাটিতে সে পার্থক্যগুলো কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর তথ্যের মাধ্যমে তুলে ধরা হবে ইনশাআল্লাহ।

পুস্তিকার নামকরণের যথার্থতা

'সালাত ব্যর্থ হচ্ছে' কথাটি লেখার জন্যে কেউ কেউ হয়তো আমার উপর রাগ করতে পারেন। তাই প্রথমে এ বিষয়ে আলোচনা করা দরকার। কোন কাজ ব্যর্থ হচ্ছে কিনা এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে সর্বপ্রথম জানা দরকার ঐ কাজটির উদ্দেশ্য। যদি দেখা যায়, ঐ কাজটি করা হচ্ছে ঠিকই কিন্তু তার উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে এমন লক্ষণ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে না, তাহলে নি:সন্দেহে বলা যাবে ঐ কাজটি ব্যর্থ হচ্ছে। আশা করি এ ব্যাপারে আপনারা কেউ দ্বিমত পোষণ করবেন না। তাহলে সালাত ব্যর্থ হচ্ছে কিনা- এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে প্রথমে আমাদের সালাতের উদ্দেশ্যটি জানতে হবে। চলুন, এ ব্যাপারে আল কুরআন কী বলছে দেখা যাক।

ইসলামে সকল আমলের একটি অনির্দিষ্ট (Non-specific) এবং একটি সুনির্দিষ্ট (Specific) উদ্দেশ্য আছে। সালাতসহ সকল আমলের অনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। একথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে-

قُلْ اِنَّ صَلاَتِیْ وَ نُسُکِیْ وَمَحْیَایَ وَ مَمَاتِیْ لِلّٰہِ رَبِّ العٰلَمِیْنَ .

অর্থ: বলো- আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু মহাবিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্য।

(আল আম/৬ : ১৬২)

আর কুরআন মজীদে আল্লাহ তা'য়ালা সালাতের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যটি উল্লেখ করেছেন এভাবে-

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

অর্থ: নিশ্চয় সালাত (ব্যক্তি ও সমাজ জীবন থেকে) অশ্লীল ও নিষিদ্ধ (অন্যায়) দূর করে।

(আনকাবুত/২৯ : ৪৫)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ এখানে বলেছেন- নিশ্চয় সালাত, সালাত আদায়কারীর ব্যক্তি এবং সমাজ থেকে ইসলামের দৃষ্টিতে যে বিষয়গুলো অশ্লীল ও অন্যায় তা দূর করে। লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ তা'য়ালা নিশ্চয়তা দিয়েই কথাটি বলছেন। তাহলে এই

আয়াতের মাধ্যমে, যে উদ্দেশ্যে আল্লাহ সালাত ফরজ করেছেন তা নিশ্চিতভাবে জানা গেলো। সালাতের সে উদ্দেশ্য হলো- মুসলিমদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন থেকে ইসলামের দৃষ্টিতে যে বিষয়গুলো অশ্লীল ও অন্যায় তা নিশ্চিতভাবে দূর করা।

এবার চলুন দেখা যাক, সালাতের এই উদ্দেশ্য কতটুকু সাধিত হচ্ছে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হলো- যত দিন যাচ্ছে আমাদের সমাজে সালাত আদায়কারীর সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশি গুণ বাড়ছে ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে অশ্লীল ও নিষিদ্ধ কাজের সংখ্যা। আপনাদের অভিজ্ঞতাও নিশ্চয়ই এর থেকে ভিন্ন হবে না। প্রায় সকল মুসলিম দেশে একই অবস্থা।

এখন সবাই নিশ্চয় একমত হবেন যে- মহান আল্লাহ যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে সালাত ফরজ করেছেন, বর্তমানে সালাত সে উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হচ্ছে। তবে এ দোষ অবশ্যই সালাতের নয়। এ দোষ সালাত আদায়কারীর।

সালাতের গুরুত্ব

ইসলামী জীবন বিধানে সালাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আমল। আর সালাত যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ, তা বুঝা যায় নিম্নের তথ্যগুলো থেকে-

১. সালাত ধনী, গরীব সকলের জন্যে ফরজ। কিন্তু ইসলামে গুরুত্বপূর্ণ আমল আছে যা সকলের জন্যে ফরজ নয়। যেমন- যাকাত ও হজ্জ শুধু ধনীদের জন্যে ফরজ
২. সফরে সালাত মাফ হয়না কিন্তু রোজা মাফ হয়
৩. অজ্ঞান অবস্থা ছাড়া সালাত মাফ হয়না কিন্তু অজ্ঞানসহ অন্য অসুস্থ্য অবস্থায় রোজা মাফ হয়
৪. সালাতকে রাসূল (সা.) বেহেশতের চাবি বলে উল্লেখ করেছেন।

সালাত ব্যর্থ হওয়ার প্রধানতম কারণ

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা নিশ্চিতভাবে জেনেছি যে- সালাত বর্তমানে তার উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হচ্ছে। এখন যদি সালাত ব্যর্থ হওয়ার প্রধান ও আনুসাঙ্গিক কারণগুলো জানতে পারা যায় এবং মুসলিমগণ যদি সে কারণগুলোর প্রতিকার করতে এগিয়ে আসে তবে সালাত অবশ্যই আবার তার উদ্দেশ্য সাধনে সফল হবে। যেমন তা হয়েছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগে।

আল কুরআনে 'সালাত' শব্দটি সর্বমোট এসেছে ১০২ (একশত দুই) বার। এর মধ্যে مصلى/صلوات/الصلاة ধরনের রূপে এসেছে ৫৫ (পঞ্চান্ন) বার। اقامة الصلاة তথা সালাত প্রতিষ্ঠার বিষয়টি তথ্য আকারে এসেছে ২৯ (উনত্রিশ) বার। আর اقيموا الصلاة তথা সালাত প্রতিষ্ঠা করার বিষয়টি আদেশ আকারে এসেছে ১৮ (আঠারো) বার। 'সালাত কায়েম করা' বাক্যটি দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালা যা বুঝাতে চেয়েছেন রাসূল (সা.) সেটি সঠিকভাবে সাহাবীগণকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এটি বুঝা যায় সাহাবীগণের এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক

অবস্থা দেখলে। পরবর্তীতে মুসলিমরা 'সালাত কায়েম করা' কথাটির সঠিক অর্থ হারিয়ে ফেলেছে। এটি বর্তমানে সালাত ব্যর্থ হওয়ার প্রধানতম কারণ। তাই, প্রথমে আমরা জানার চেষ্টা করবো 'আকিমুস্ সালাত' কথাটির প্রচলিত ও প্রকৃত অর্থ।

'আকিমুস্ সালাত' কথাটির প্রচলিত অর্থ

'আকিমুস্ সালাত' কথাটির সরল অর্থ হচ্ছে 'সালাত প্রতিষ্ঠা করো'। বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয় 'সালাত প্রতিষ্ঠা করা' কথাটির অর্থ হিসেবে এ কথাটি সঠিক না ভুল- 'সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন (আরকান-আহকাম) মেনে নিজে নিষ্ঠার সাথে আদায় করা এবং সমাজের সবাই যেন সালাতের অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে আদায় করতে পারে তার ব্যবস্হা করা'। প্রায় সকলে উত্তর দিবে সঠিক। আর তাই সালাতের অনুষ্ঠানটি কিভাবে করতে হবে এটি শেখানো র জন্য নানা ধরনের পুস্তিকা ও ক্লাস মুসলিম বিশ্বে উপস্থিত আছে।

কিন্তু 'সালাত প্রতিষ্ঠা করা' কথাটির এ অর্থ আর কুরআন, সুন্নাহ (হাদীস) ও Common sense-এ থাকা অর্থের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। তাই চলুন প্রথমে আমরা 'আকিমুস্ সালাত' কথাটির প্রকৃত অর্থ জেনে নেই।

'আকিমুস্ সালাত' কথাটির প্রকৃত অর্থ

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস কুরআন, সুন্নাহ (হাদীস) ও Common sense-এর তথ্য এবং ২০পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

Common sense

যে কাজ করতে গেলে সবাইকে কিছু নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান করতে হয় তাকে আনুষ্ঠানিক কাজ বলে। যেসব বিষয়ের মধ্যে আনুষ্ঠানিক কাজ উপস্থিত আছে তার কয়েকটি হলো- চিকিৎসা বিজ্ঞান, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী। চিকিৎসা বিজ্ঞান, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসায় উপস্থিত আনুষ্ঠানিক কাজটি হলো পাঠ দান ও গ্রহন করা। এখানে যে নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান সকলকে করতে হয় তা হলো- লেকচার রুমে গিয়ে শিক্ষকদের লেকচার শোনা, বই পড়া, পরীক্ষা দেয়া ইত্যাদি। চিকিৎসা বিজ্ঞানের জন্য অতিরিক্ত আছে- লাশ কাটার ঘরে গিয়ে লাশ কাটা, হাসপাতালে গিয়ে রোগী দেখা, অপারেশন থিয়েটারে গিয়ে অপারেশন দেখা ইত্যাদি।

অন্যদিকে সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানীর সাথে জড়িত থাকা আনুষ্ঠানিক কাজটি হলো বিষয়গুলোর অনুষ্ঠান। সালাতের জন্য তা হলো- রুকু, সিজদা, কিয়াম, কিরাত ইত্যাদি। সিয়ামের জন্য সেটি হলো- সুবেহ সাদেক থেকে সুর্যাস্ত পর্যন্ত খাওয়া, পান করা এবং বৈধ যৌনসম্ভোগ থেকে বিরত থাকা।

মানুষকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় 'চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠা করা' কথাটির অর্থ নিম্নের কোনটি হবে?

১. সুন্দর বিল্ডিং বানিয়ে মেডিকেল কলেজের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে পালন করার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা
২. মেডিকেল কলেজের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

যার সামান্যতম Common sense আছে সে বলবে দ্বিতীয়টি।

এবার যদি মানুষকে জিজ্ঞাসা করা হয় এ উদাহরণের আলোকে 'সালাত প্রতিষ্ঠা করা' বাক্যটির অর্থ নিম্নের দু'টির কোনটি হবে?

১. সুন্দর মসজিদ বানিয়ে সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে পালন করার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা
২. সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা

Common sense ধারী সকলেই বলবে দ্বিতীয়টি।

তাই, Common sense অনুযায়ী 'সালাত প্রতিষ্ঠা (কায়েম) করা' বাক্যটির অর্থ হবে- সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা

♣♣ ২০পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী এ পর্যায়ে তাহলে বলা যায়- 'সালাত প্রতিষ্ঠা (কায়েম) করা' বাক্যটির অর্থ হিসেবে ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো- সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা

আল কুরআন থেকে কোন বিষয়ের তথ্য খুজে পাওয়ার পূর্বশর্ত

কুরআন পড়ে সেখানে থাকা যেকোন বিষয়ের তথ্য খুঁজে বের করতে হলে ঐ বিষয়ের ইসলামের প্রাথমিক রায় তথা Common sense- এর রায় আগে থেকে মাথায় থাকতে হবে। এটি না হলে ঐ বিষয়ে থাকা কুরআনের বক্তব্য মানুষের চোখে ধরা দিবে না। একথটি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে-

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ.

অর্থ: তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন অন্তরের (অন্তরে থাকা Common sense-এর) অধিকারী হতে পারতো যার মাধ্যমে (কুরআন ও সুন্নাহ

দেখে পড়লে সঠিকভাবে) বুঝতে পারতো এবং এমন কানের অধিকারী হতে পারতো যা (কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য শোনার পর সঠিকভাবে বুঝার মতো) শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন হতো। প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে অন্তর (অন্তরে থাকা Common sense) যা কেন্দ্রে (কেন্দ্রীয় স্নায়ূতন্ত্র/Central nervous system তথা ব্রেইনে) অবস্থিত।

(হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির প্রথম অংশে বলা হয়েছে- মানুষ দেশ ভ্রমণ করলে কুরআন ও সুন্নাহ সঠিকভাবে বুঝার মতো Common sense এবং শ্রুতিশক্তির অধিকারী হতে পারে। এর কারণ হলো- পৃথিবী ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানে থাকা বাস্তব (সত্য) বিষয় বা উদাহরণ দেখে জ্ঞান অর্জিত হয়। এর মাধ্যমে মানুষের অন্তরে থাকা Common sense উৎকর্ষিত হয়। ঐ উৎকর্ষিত Common sense-এর মাধ্যমে মানুষ কুরআন ও সুন্নাহ দেখে পড়ে বা শুনে সহজে বুঝতে পারে তথা সঠিক জ্ঞান লাভ করতে পারে।

আয়াতখানির দ্বিতীয় অংশে মহান আল্লাহ প্রথম অংশে বলা বিষয়টি ঘটার কারণটি বলে দিয়েছেন। সে কারণ হলো- মানুষের অন্তর তথা অন্তরে থাকা Common sense-এ একটি বিষয় সম্পর্কে পূর্বে ধারণা না থাকলে বিষয়টি চোখে দেখে বা কানে শুনে মানুষ সঠিকভাবে বুঝতে পারে না। এ কথাটিই ইংরেজীতে বলা হয় এভাবে- What mind does not know eye will not see.

তাই Common sense-এ একটি বিষয় সম্পর্কে পূর্বে ধারণা না থাকলে ঐ বিষয়ের কুরআনের আয়াত ও সুন্নাহ দেখে পড়ে বা কানে শুনে মানুষ সঠিকভাবে বুঝতে পারে না।

লক্ষনীয় হলো- আয়াতখানিতে বর্ণনা করা ঘটনাটি কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে শুধু ঘটে এ রকম বলা হয়নি। তাই এ ঘটনা- আকিমুস্ সালাতসহ সকল বিষয়ের জন্য প্রযোজ্য।

আল কুরআনের এ কথাগুলো মাথায় রেখে চলুন আমরা এখন 'আকিমুস্ সালাত' বিষয়ে কুরআনে থাকা তথ্যগুলো খুঁজে বের করা এবং তার মাধ্যমে বিষয়টিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করি।

আল কুরআন

তথ্য-১.১

وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ

অর্থ: তুমি যে কিবলার দিকে ছিলে তাকে কিবলা নির্ধারণ করেছিলাম শুধু এটা জানার জন্য যে, কে রাসূলের অনুসরণ করে আর কে পিছনের (পূর্বাবস্থায়) দিকে ফিরে যায়।

(বাকারাহ/২ : ১৪৩)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির বক্তব্য ভালভাবে বুঝতে হলে এর নাযিলের পটভূমিটি আগে জানা দরকার। মদিনায় হিজরতের পর মুসলমানরা প্রথমে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত পড়ত। পরে আল্লাহর নির্দেশ আসে কাবা শরীফের দিকে অর্থাৎ পূর্ব দিকে মুখ করে সালাত পড়ার জন্যে। আল্লাহর নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানরা তা পালন করতে শুরু করে। এটি দেখে কাফেররা উপহাস করে বলতে লাগলো- দেখ মুসলিমরা কী পাগলামি শুরু করেছে। কাল তারা সালাত পড়েছে পশ্চিম দিকে মুখ করে আর আজ পড়ছে পূর্ব দিকে মুখ করে। কাফেরদের এই কথার জবাবে আল্লাহ এই আয়াতটি নাযিল করেন এবং এর মাধ্যমে তিনি ঐ কেবলা পরিবর্তন করার আদেশের উদ্দেশ্যটি বলে দিয়েছেন। আল্লাহ বলছেন, সালাত পড়ার সময় তোমাদের মুখ একদিক থেকে আর একদিকে ফেরানোর অর্থাৎ কেবলা পরিবর্তনের যে আদেশ আমি দিয়েছিলাম, তার পেছনে মুখ ফেরানোর অনুষ্ঠানটি করানো আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমার উদ্দেশ্য ছিল এটি জেনে নেয়া- কে রাসূলকে তথা রাসূলের মাধ্যমে দেয়া আমার আদেশ মেনে নেয়াকে তাদের অন্য সব কিছুর উপর অগ্রাধিকার দেয়।

এ বক্তব্য থেকে বুঝা যায়- সালাতের সময় কাবার দিকে মুখ ফেরানো, রুকু করা, সিজদা করা ইত্যাদি আদেশের পেছনে আল্লাহর উদ্দেশ্য শুধু ঐ অনুষ্ঠানগুলো পালন করানো নয়। এর পেছনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে- আল্লাহর আদেশ পালনের মানসিকতা তৈরীর শিক্ষা দেয়া। যাতে সালাত আদায়কারী সালাতের বাইরের প্রতিটি কাজ আল্লাহর আদেশ অনুসরণ করে পালন করে।

তথ্য-১.২

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ .

অর্থ: (সালাতের আগে ওজু বা গোসল করার নির্দেশ দেয়ার মাধ্যমে) আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দিতে চান না বরং তিনি তোমাদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করতে চান (পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার নীতিমালা শিক্ষা দিতে চান) ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা (আদেশটি মানার পর এর উপকারিতা দেখে আমার) শোকর আদায় করো।

(মায়েদাহ/৫ : ০৬)

ব্যাখ্যা: আয়াতখানির প্রথম অংশে (অনুল্লিখিত) সালাতের আগে ওজু, গোসল বা তায়াম্মুম করার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং কখন ও কিভাবে তা করতে হবে তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হয়েছে। এরপর আয়াতটির এই (উল্লিখিত) অংশে মহান আল্লাহ ঐ আদেশের কারণ উল্লেখ করেছেন।

আয়াতখানির এ অংশের প্রথমে আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন-সালাতের আগে ওজু, গোসল (এবং কুরআনের অন্য স্থানের আদেশের মাধ্যমে কাপড় ও জায়গা তথা পরিবেশ) পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার শর্ত আরোপের পেছনে মানুষকে কষ্ট দেয়া তাঁর উদ্দেশ্য নয়। অতঃপর আল্লাহ এ আদেশের পেছনে থাকা তাঁর উদ্দেশ্যটি জানিয়ে দিয়েছেন। সেটি হলো মানুষকে তার শরীর, পোশাক ও পরিবেশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার নীতিমালা শিক্ষা দেয়া। সে নীতিমালা হচ্ছে শরীরের উন্মুক্ত জায়গাগুলো প্রত্যেক দিন কয়েকবার পানি দিয়ে ধুয়ে-মুছে এবং পুরো শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ ও পরিবেশ, প্রতিদিন বা কয়েক দিন পর পর ধুয়ে-মুছে পরিস্কার করা বা পরিস্কার রাখা।

সালাতের আগে শরীর, কাপড় ও পরিবেশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার আদেশের পেছনে উদ্দেশ্য যে ঐ সকল জিনিস পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা এবং সে ব্যাপারে সময়ের ব্যবধান কী হবে তার একটি সাধারণ নীতিমালা শিক্ষা দেয়া তা বুঝা যায় আয়াতটির সর্বশেষে উল্লেখ করা আল্লাহর কথাটির মাধ্যমে। আল্লাহ সেখানে বলেছেন- শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ ও পরিবেশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করার আদেশের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি আমার কল্যাণের অভিপ্রায়কে পূর্ণ করে দিতে চাই। যাতে তোমরা ঐ কাজগুলো করে কল্যাণপ্রাপ্ত হয়ে আমার শুকর বা গুণগান করতে পার।

পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার এ আদেশের মাধ্যমে আল্লাহর দিতে চাওয়া সেই কল্যাণের বিষয়টি হচ্ছে মানুষকে রোগমুক্ত রাখা। মানুষের শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ ও পরিবেশ যদি পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে তবে তাদের অনেক রোগ কম হয় বা অনেক রোগ হয় না এটি বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রমাণিত একটি তথ্য।

আর শরীর, কাপড় ও জায়গা পাকের আদেশ দেয়ার পেছনে থাকা উদ্দেশ্যটি যদি এটি না হতো তবে- বিবাহ না করা, স্ত্রী বা স্বামী না থাকা বা বার্ধক্য ও অন্য কারণে বৈধ যৌন মিলনের ক্ষমতা না থাকা ইত্যাদি অবস্থায় সপ্তাহ, মাস বা বছর গোসল না করে শুধু ওজু করে একজন লোক সালাত পড়তে পারত। এ ক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তি ঘন ঘন গোসল করে পুরো শরীর পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার মাধ্যমে অনেক রোগ থেকে মুক্ত থাকা স্বরূপ আল্লাহর চাওয়া বড় কল্যাণটি থেকে বঞ্চিত হতো।

♦♦ আল কুরআনের এ দু'টি আয়াত থেকে তাই পরিস্কার বুঝা যায়- সালাতের বিভিন্ন অনুষ্ঠান থেকে মহান আল্লাহ কিছু না কিছু শিক্ষা দিতে চেয়েছেন।

তথ্য-২

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ .

অর্থ: (সালাতে শুধু) মুখ পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে ফিরানোতে কোনো কল্যাণ (সওয়াব) নেই বরং সওয়াবের কাজ সে করে যে- আল্লাহ, আখিরাতের দিন, ফেরেস্তাগণ, (আসমানি) কিতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহর ভালোবাসায় নিজ ধন-সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকিন, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও আটকানো ঘাড় (যে কোনো ধরনের দাসত্বের শৃংখল) মুক্তির জন্য দান করে, আর সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয়, অঙ্গীকার করলে তা পূর্ণ করে; বিপদ-আপদ, অভাব-অনটন ও যুদ্ধের সময়ে ধৈর্যধারণ করে; তারাই সত্যবাদী; আর তারাই হলো আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তি।

(বাকারা/২ : ১৭৭)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতখানিও মুসলিমদের কেবলা পরিবর্তন করে সালাত পড়ার জন্যে কাফেরদের ঠাট্টা-বিদ্রূপের পরিপ্রেক্ষিতে নাযিল হয়। আয়াতখানির প্রথমে মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে- সালাতের সময় মুখ পশ্চিম বা পূর্ব করাতে কোন সাওয়াব (কল্যাণ) নেই। অর্থাৎ সালাতের শুধু অনুষ্ঠান করার মধ্যে কোন সাওয়াব নেই।

এরপর যে সকল কাজের মধ্যে সাওয়াব রয়েছে তার কয়েকটির বর্ণনা এখানে দেয়া হয়োছে। বাকিগুলো সমস্ত কুরআনে ছড়িয়ে আছে। এ আয়াতে প্রকৃত সওয়াব বা কল্যাণের কাজ হিসেবে যেগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো-

১. আল্লাহ, পরকাল, কিতাব ও নবীদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা

২. শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে নিজ সম্পদ অভাবী আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতিম, মিসকিন, পথিক, সাহায্যপ্রার্থী ও যে কোনো ধরনের দাসত্বের শৃঙ্খলে আটকানো ঘাড় মুক্তির জন্যে ব্যয় করা

৩. সালাত কায়েম করা

৪. যাকাত দেয়া

৫. ওয়াদা করলে তা রক্ষা করা এবং

৬. বিপদ-আপদ ও হক-বাতিলের দ্বন্দ্বের সময়, হকের পক্ষে ধৈর্য্য ধারণ করা তথা দৃঢ় পদে দাঁড়িয়ে থাকা।

আয়াতখানিতে প্রথমে আল্লাহ বলছেন- সালাতের সময় মুখ পশ্চিম বা পূর্ব দিকে ফিরানোর মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। অর্থাৎ সালাতের শুধু অনুষ্ঠান করার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। এরপর যে সমস্ত কাজের মধ্যে সওয়াব বা কল্যাণ আছে তার কয়েকটির বর্ণনা তিনি দিয়েছেন। এর মধ্যে একটি হচ্ছে 'সালাত কায়েম করা'।

তাই আয়াতখানির সালাত সম্পর্কিত বক্তব্য হলো- সালাতের সময় মুখ পূর্ব না পশ্চিম দিকে করা তথা সালাতের অনুষ্ঠান করায় কোন সওয়াব নেই। সওয়াব আছে সালাত প্রতিষ্ঠা করায়। তাই, এ আয়াতের আলোকে সহজে বুঝা যায়, 'সালাতের অনুষ্ঠান করা' এবং 'সালাত প্রতিষ্ঠা করা' বিষয় দু'টির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য আছে।

১ নং তথ্যের আয়াত দু'টির মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন সালাতের প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে তিনি সালাত আদায়কারীকে কিছু না কিছু শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। তাই, ২ নম্বর তথ্যের আয়াত দু'টির বক্তব্যের সাথে এক নম্বর তথ্যের আয়াতখানির বক্তব্য মিলালে সহজেই বলা যায়- সালাত কায়েম করার অর্থ হবে সালাতের অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা বাস্তবে কায়েম তথা প্রতিষ্ঠা করা।

তথ্য-৩

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَوتِهِمْ سَاهُوْنَ. الَّذِيْنَ هُمْ يُرَاءُوْنَ. وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ.

অর্থ: অতঃপর দুর্ভোগ (ওয়াইল নামক জাহান্নাম) সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য। যারা তাদের সালাতের (সময়, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ইত্যাদি) সম্বন্ধে উদাসীন। যারা লোক দেখানো কাজ করে। আর পাতিলের ঢাকনি (ছোট-খাট জিনিস) মানুষকে দেয়া থেকে বিরত থাকে।

(মাউন/১০৭ : ৪-৬)

ব্যাখ্যা: হাদীসে সালাতকে বেহেশতের চাবী বলা হয়েছে। কিন্তু এ ৪খানি আয়াতে বলা হয়েছে যে সকল সালাত আদায়কারীর নিম্নের তিনটি দোষ থাকবে তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম অর্থাৎ তাদের সালাত কবুল হবে না-

- সালাতসহ যেকোন আমলের সময়, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ইত্যাদি সম্বন্ধে উদাসীন থাকা
- মানুষকে দেখানোর জন্য কাজ করা
- ছোট-খাট জিনিসও মানুষকে দান করা হতে বিরত থাকা তথা কৃপণ হওয়া

প্রশ্ন হলো কি কারণে ঐ তিনটি দোষ থাকা সালাত আদায়কারীগণের সালাত কবুল হবে না এবং তাদেরকে দোযখে যেতে হবে? এ প্রশ্নের উত্তর হলো- সালাতে পঠিত বিষয় কুরআনের তিনটি শিক্ষা হচ্ছে-

১. সালাতসহ অন্য আমল সঠিক সময়, নিষ্ঠা, একাগ্রতা ইত্যাদি সহকারে করা
২. মানুষকে দেখানো জন্য নয় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সকল আমল করা
৩. কৃপন না হওয়া

আয়াতগুলোতে বর্ণনা করা সালাত আদায়কারীদের সালাত কবুল না হওয়া এবং ফলস্বরূপ জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হলো- তারা শুধু সালাতের অনুষ্ঠান করেছে। সালাতের পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নেয়নি। ফলে তারা সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারেনি। অর্থাৎ তারা সালাত প্রতিষ্ঠা করেনি। তারা শুধু সালাতের অনুষ্ঠান পালন করেছে।

তাই, এ চারখানি আয়াত থেকে বুঝা যায় সালাত প্রতিষ্ঠা করার অর্থ হলো- সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে তার পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা বাস্তবে কায়েম করা। এ আয়াতগুলো থেকে আরো জানা যায়-সালাতের পঠিত বিষয় থেকে শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা কায়েম না করলে সালাত কবুল হবে না।

তথ্য-৪

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِي لِلصَّلَوةِ مِن يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ط ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُوْنَ.

অর্থ: হে যারা ঈমান এনেছো! জুমু'আর দিনে যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর যিক'রের দিকে (সালাতের দিকে) দৌড়াও এবং বেচা-কেনা পরিত্যাগ করো; এটাই তোমাদের জন্য (অধিক) উত্তম যদি তোমরা জানতে।

(জুম'আ/৬২ : ৯)

ব্যাখ্যা: আয়াতে কারীমায় জুম'আর সালাতের আযান হওয়ার সাথে সাথে সকলকে কেনা-বেচা অর্থাৎ কাজকর্ম ছেড়ে জামায়াতে সালাত আদায়ের জন্যে দ্রুত মসজিদে চলে যেতে বলা হয়েছে। এরপর মহান আল্লাহ বলেছেন- এটি যে ঈমানদারদের জন্যে অধিক কল্যাণকর তা তারা বুঝতে পারতো যদি বাস্তবে তারা তা দেখতে পেতো।

সাধারণভাবে মনে হয়- কাজ-কর্ম রেখে জামায়াতে সালাত আদায় করতে গেলে কিছু না কিছু আর্থিক ক্ষতি হয়। কিন্তু আল্লাহ বলেছেন এটি অধিক কল্যাণকর। কেন আল্লাহ এরকম বলেছেন জানতে চাইলে যে উত্তর সাধারণত পাওয়া যায় তা হলো- জামায়াতে সালাত আদায় করায় পরকালে যে কল্যাণ পাওয়া যাবে তার সাথে

দুনিয়ার ঐ সামান্য সময়ের উপার্জনের কোন তূলনা হয় না। কিন্তু মানুষ দুনিয়ার কল্যাণ আগে পেতে চায়। আর আল্লাহ তা'য়ালাও পরকালের কল্যাণের পূর্বে দুনিয়ার কল্যাণ পাওয়ার জন্য তাঁর নিকট দোয়া করতে বলেছেন।

মহান আল্লাহর এরকমটি বলার কারণ হলো- কাজ-কর্ম রেখে জামায়াতে সালাত আদায় করতে মসজিদে চলে গেলে কিছু ক্ষতি অবশ্যই হয়। কিন্তু জামায়াতে সালাত আদায়ের মাধ্যমে তিনি সমাজ জীবনের যে শিক্ষা দিয়েছেন সে শিক্ষাগুলো বুঝে বুঝে মনে-প্রাণে গ্রহণ করে প্রতিটি সালাত আদায়কারী যদি তা তাদের সমাজ জীবনে প্রয়োগ করে (প্রতিষ্ঠা করে) তবে দুনিয়ায় তাদের ব্যাপক কল্যাণ হবে। আর সেই কল্যাণ জামায়াতে সালাত আদায় করার সময়টুকুতে অন্য কাজ করার কল্যণের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি। ঐ শিক্ষাগুলোর বাস্তব প্রয়োগ যে সমাজে নেই সে সমাজে অনেক টাকা রোজগার করে বাসার যাওয়ার সময় রাস্তায় হাইজাকার এসে সে টাকা কেড়ে নিয়ে যেতে পারে। এমনকি ঐ সময় তার জীবনও চলে যেতে পারে। কথাটি যে কত বাস্তব জামায়াতে সালাতের শিক্ষাগুলো (পরে আসছে) পর্যালোচনা করলে যে কেউই সহজে তা বুঝতে পারবে। আর পরকালে জামায়াতে সালাত আদায় করার জন্যে যে অতিরিক্ত পুরস্কার বা কল্যাণ পাওয়া যাবে, তার সঙ্গে ঐ অল্প সময় কাজ-কর্ম করার দরুন যে লাভ হবে, তার তো কোন তুলনাই হবে না।

তাই এ আয়াতখানির বক্তব্য থেকেও বুঝা যায় সালাত প্রতিষ্ঠা করার অর্থ হবে- সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা বাস্তবে কায়েম করা। ।

তথ্য-৫

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ

অর্থ: আমরা যদি তাদেরকে (মু'মিনদেরকে) পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করি (বিজয়ী করি/শাসন ক্ষমতা দেই) তবে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে (আদায় করবে), সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজে বাধা প্রদান করবে।

(হাজ্জ/২২ : ৪১)

ব্যাখ্যা: যদি প্রশ্ন করা হয় 'আকিমুস্ সালাত' সম্পর্কে পূর্বে আলোচনাকৃত আয়াতসমূহের তথ্যগুলো সামনে রাখলে এ আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা নিম্নের দু'টির কোনটি হবে-

১. মু'মিনগণ যদি পৃথিবীতে শাসন ক্ষমতা পায় তবে তারা- সালাতের অনুষ্ঠান সুষ্ঠভাবে পালন করার সকল ব্যবস্থা করবে, যাকাত আদায় করবে, সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ প্রতিরোধ করবে

২. মু'মিনগণ যদি পৃথিবীতে শাসন ক্ষমতা পায় তবে তারা- সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করার সকল ব্যবস্থা করবে, যাকাত আদায় করবে, সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ প্রতিরোধ করবে।

আমারতো মনে হয় Common sense থাকা সকল মানুষই দ্বিতীয়টি পক্ষে রায় দিবে।

তাই এ আয়াতে অনুযায়ীও- সালাত প্রতিষ্ঠা করা বলতে শুধু সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে পালন করার ব্যবস্হা প্রতিষ্ঠা করা বুঝায় না। সালাত প্রতিষ্ঠা করা বলতে বুঝায়- সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে, সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

তথ্য-৬

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي.

অর্থ: নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, অতএব (হে মুসা) আমার দাসত্ব করো (দাসত্বের শর্ত পূরণ করে জীবন পরিচালনা করো) এবং আমার যিক'র-এর লক্ষ্যে সালাত প্রতিষ্ঠা করো।

(ত্বাহা/২০ : ১৪)

ব্যাখ্যা: আল্লাহর যিক'র করার প্রকৃত অর্থ হলো- আল্লাহর আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, গুণাগুণ ইত্যাদি স্মরণ করা এবং পরে তা অনুসরণ করা। তাই যদি প্রশ্ন করা হয় 'আকিমুস্ সালাত' সম্পর্কে পূর্বে আলোনাকৃত আয়াতসমূহের তথ্যগুলো সামনে রাখলে এ আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা নিম্নের দু'টির কোনটি হবে-

১. নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, অতএব (হে মুসা) আমার দাসত্ব করো। আর আমার আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, গুণাগুণ ইত্যাদি স্মরণ রাখা এবং অনুসরণ করার বিষয়টিতে সফল হওয়ার জন্য সালাতের শুধু অনুষ্ঠান করার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করো

২. নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই, অতএব (হে মুসা) আমার দাসত্ব করো। আর আমার আদেশ, নিষেধ, উপদেশ, গুণাগুণ ইত্যাদি স্মরণ রাখা এবং অনুসরণ করার বিষয়টিতে সফল হওয়ার জন্য সালাতের অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করো।

আমারতো মনে হয় Common sense থাকা সকল মানুষই দ্বিতীয়টি পক্ষে রায় দিবে।

তাই এ আয়াতে অনুযায়ীও- সালাত প্রতিষ্ঠা করা বলতে শুধু সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে পালন করার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা বুঝায় না। সালাত প্রতিষ্ঠা করা বলতে বুঝায়- সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে, সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

♣♣ তাহলে দেখা যায় সালাত কায়েম করার প্রকৃত অর্থের বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই, ২০পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের ইসলামী নীতিমালা অনুযায়ী ঐ প্রাথমিক রায়ই হবে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। অর্থাৎ আর তাই 'সালাত কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করা' বাক্যটির অর্থের বিষয়ে ইসলামের চূড়ন্ত রায় হলো-সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

আল হাদীস

হাদীস-১

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فُلاَنَةً يُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَوتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي النَّارِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ فَإِنَّ فُلاَنَةً يُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلَوتِهَا وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ وَلاَ تُؤْذِي جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ هِيَ فِي الْجَنَّةِ.

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, একদা জনৈক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, অমুক মহিলা সালাত ও যাকাতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তবে সে নিজের মুখ দ্বারা তার প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়। তিনি বললেন, সে জাহান্নামী। লোকটি আবার বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, অমুক মহিলা সম্পর্কে জনশ্রুতি আছে যে, সে কম (নফল) রোজা রাখে, কম (নফল) সদকা করে এবং সালাতও (নফল) কম পড়ে। তার দানের পরিমাণ হলো পনিরের টুকরাবিশেষ (খুবই কম)। কিন্তু সে নিজের মুখ দ্বারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় না। রাসূল সা. বললেন, সে জান্নাতী।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: মুসনাদে আহমাদ, হাদিস নং-৯৬৭৩)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানিতে উল্লেখিত প্রথম মহিলাকে প্রচুর সালাত আদায় করেছে কিন্তু প্রতিবেশীকে মুখ দ্বারা কষ্ঠ দেয়ার কারণে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। আর দ্বিতীয় মহিলা কম সালাত (নফল সালাত) আদায় করেছে কিন্তু প্রতিবেশীকে মুখ দ্বারা কষ্ঠ না দেয়ার কারণে সে জান্নাত পাবে। কি কারণে এ দুই মহিলার ঠিকানার ব্যাপক পার্থক্য হলো সেটি এক বিরাট প্রশ্ন, তাই না?

এ প্রশ্নের উত্তর হলো-'প্রতিবেশীকে মুখ দ্বারা কষ্ঠ না দেয়া' সালাতের পঠিত বিষয়ের (কুরআন) একটি শিক্ষা। প্রথম মহিলা প্রচুর সালাত পড়ার পরও প্রতিবেশীকে মুখ দ্বারা কষ্ট দিয়েছে। এখান থেকে বুঝা যায় সে প্রচুর সালাত আদায় করেও সালাতের এ শিক্ষাটি নেয়নি। তাই সে ঐ সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করতেও পারেনি। অর্থাৎ সে শুধু সালাতের অনুষ্ঠান করেছে। অনুষ্ঠান থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা বাস্তবে কায়েম করেনি তথা সালাত কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করেনি। এ কারণে তার সালাত কবুল হয়নি এবং তাকে জাহান্নামে যেতে হবে।

অন্যদিকে হাদীসে উল্লিখিত দ্বিতীয় মহিলা সালাত কম পড়লেও প্রতিবেশীকে মুখ দ্বারা কষ্ট দেয়নি। এখান থেকে বুঝা যায় সে সালাত কম আদায় করলেও তা থেকে শিক্ষা নিয়েছে এবং সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করেছে। অর্থাৎ সে সালাত কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করেছে। এ কারণে তার সালাত কবুল হয়েছে এবং সে জান্নাত পেয়েছে।

তাই এ হাদীসখানির আলোকে বলা যায়- 'সালাত কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করা' বাক্যটির অর্থ হবে, সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

তথ্য-২

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَوةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَوةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ.

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বললেন- তোমরা কি জান, সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি কে? সাহাবায়েকিরাম জবাব দিলেন, আমাদের মধ্যে দরিদ্র হল সে, যার টাকা-পয়সা ও ধন-সম্পদ নেই। তিনি বললেন, আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি সে, যে কিয়ামতের ময়দানে সালাত, রোজা ও যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে কিন্তু তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আসতে থাকবে যে সে কোন মানুষকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা দোষারোপ করেছে, কারও সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করেছে, কারো রক্ত অন্যায়ভাবে প্রবাহিত করেছে বা কাউকে অন্যায়ভাবে আঘাত করেছে। অত:পর তার সালাত, রোজা, যাকাত ইত্যাদি আমলগুলোকে বিনিময় হিসাবে ঐ ক্ষতিগ্রস্ত বা কষ্টপ্রাপ্ত লোকগুলোকে দেয়া হতে থাকবে। এভাবে তার

সকল আমল বিনিময় দিয়ে শেষ হয়ে যাবার পর দাবিদারদের পাপগুলো তার উপর চাপানো হবে। অবশেষে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: মুসলিম, হাদিস নং-৬৭৪৪)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানি থেকে জানা যায়- সালাত আদায় করার সাথে সাথে কেউ যদি মানুষকে গালি দেয়, কাউকে মিথ্যা দোষারোপ করে, কারো সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, কারো রক্ত অন্যায়ভাবে প্রবাহিত করে, কাউকে অন্যায়ভাবে আঘাত করে তবে তার ঐ সালাত পরকালে কাজে আসবে না (কবুল হবে না) এবং তাকে জাহান্নামে যেতে হবে। কারণ ঐ কাজগুলো থেকে দুরে থাকা হলো সালাতের পঠিত বিষয়ের শিক্ষা। তাই, সালাত পড়ার পর ঐ কাজগুলো করার অর্থ হলো সালাতের অনুষ্ঠান করে তা থেকে শিক্ষা না নেয়া এবং সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করতে না পারা।

তাই এ হাদীসখানির আলোকে বলা যায়- 'সালাত কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করা' বাক্যটির অর্থ হবে, সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে, প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

♦♦ এ বিষয়ে আরো হাদীস হাদীসের গ্রন্থসমূহে আছে। তাহলে দেখা যায়- 'সালাত কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করা' বাক্যটির অর্থ সম্পর্কে ইসলামের চূড়ান্ত রায় সমর্থনকারী হাদীস উপস্থিত আছে।

সালাতের শিক্ষাসমূহের শিরোনাম

চলুন এখন সালাতের শিক্ষাগুলো পর্যালোচনা করা যাক। প্রথমে আমরা শিক্ষাসমূহকে শিরোনাম আকারে উল্লেখ করবো। পরে কিভাবে ঐ শিক্ষাগুলো সালাত থেকে দেয়া হয়েছে তা উল্লেখ করা হবে।

মহান আল্লাহ দু'ভাবে সালাত থেকে শিক্ষা দিয়েছেন-

ক. অনুষ্ঠানের মাধ্যমে
খ. পঠিত বিষয়ের মাধ্যমে

অনুষ্ঠান থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো দু'ভাগে বিভক্ত। যথা-

১. ব্যক্তি জীবনের শিক্ষা (পৃষ্ঠা-৩৬)
২. সমাজ জীবনের শিক্ষা (পৃষ্ঠা-৪৪)

অনুষ্ঠান থেকে দিতে চাওয়া ব্যক্তি জীবনের প্রধান শিক্ষাগুলো হলো-

১. আল্লাহর আদেশ মানার মানসিকতা তৈরি করার শিক্ষা (পৃষ্ঠা-৩৭)
২. সর্বপ্রথম কুরআন থেকে ইসলামের জ্ঞান অর্জন করার শিক্ষা (পৃষ্ঠা-৩৭)
৩. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি ও নীতিমালার শিক্ষা (পৃষ্ঠা-৩৯)
৪. সময় জ্ঞানের শিক্ষা (পৃষ্ঠা-৪০)

৫. পর্দা করার শিক্ষা (পৃষ্ঠা-৪১)
৬. শরীর-স্বাস্থ্য সুস্থ সবল রাখার শিক্ষা (পৃষ্ঠা-৪২)

অনুষ্ঠান থেকে দিতে চাওয়া সমাজ জীবনের প্রধান শিক্ষাগুলো হলো-

১. পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব,বন্ধুত্ব,ভালবাসা ইত্যাদি সৃষ্টি হওয়ার শিক্ষা (পৃষ্ঠা-৪৬)
২. সামাজিক সাম্য তৈরির শিক্ষা (পৃষ্ঠা-৪৭)
৩. দলবদ্ধ ও হয়ে কাজ করার শিক্ষা (পৃষ্ঠা-৪৮)
৪. সমাজ পরিচালনা পদ্ধতির শিক্ষাসমূহ-
   ক. নেতা নির্বাচন করার শিক্ষা (পৃষ্ঠা-৬৭)
   খ. নেতা হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় গুণাগুণের শিক্ষা (পৃষ্ঠা-৬৭)
   গ. নেতা নির্বাচন পদ্ধতির শিক্ষা (পৃষ্ঠা-৬৮)
   ঘ. নেতার সমাজ বা দেশ পরিচালনা পদ্ধতির শিক্ষা (পৃষ্ঠা-৬৮)
   ঙ. নেতার আনুগত্য ও অপসারণ পদ্ধতির শিক্ষা (পৃষ্ঠা-৬৯)
৫. নেতা পুরুষ বা মহিলা হওয়ার ব্যাপারে শিক্ষা (পৃষ্ঠা-৭০)

সালাতের পঠিত বিষয়ের শিক্ষাগুলো সার্বিকভাবে যে সকল উপায়ে দেয়া হয়েছে-

১. সূরা ফাতেহা পড়া থেকে শিক্ষা (পৃষ্ঠা-৭১)
২. কুরআনের অন্য আয়াতসমূহ পড়া থেকে শিক্ষা (পৃষ্ঠা-৭৬)
৩. তাসবীহ পড়া থেকে শিক্ষা (পৃষ্ঠা-৭৯)
৪. দোয়া থেকে শিক্ষা (পৃষ্ঠা-৮২)

প্রধান শিক্ষাসমূহ সালাত থেকে যে পদ্ধতিতে দেয়া হয়েছে

যেকোন ব্যবহারিক (Applied) বিষয়ের শিক্ষা তাত্ত্বিক (Theoretical) ও ব্যবহারিক (Practical) এ দুই উপায়ে দেয়া হয়। যেমন- চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, কম্পিউটার সাইন্স, ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি, জীববিজ্ঞান ইত্যাদি। সালাত হলো মানুষের জীবন পরিচালনা নামক ব্যবহারিক বিষয়টির ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালার প্রনয়ণ করা একটি পরিপূর্ণ শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা। তাই সালাত থেকে মানুষের জীবনের প্রধান শিক্ষাসমূহ দুটি পদ্ধতিতে দেয়া হয়েছে-

১. তাত্ত্বিকভাবে (Theoretically)- সালাতের পঠিত বিষয়ের মাধ্যমে
২. ব্যবহারিকভাবে (Practically)- সালাতের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে

ব্যক্তি জীবনের প্রধান শিক্ষাগুলো তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকভাবে সালাত থেকে যেভাবে দেয়া হয়েছে

একজন ব্যক্তি তার ব্যক্তি জীবনকে যাতে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারে সে জন্যে প্রয়োজনীয় প্রধান শিক্ষাগুলো সালাতের মাধ্যমে দেয়া হয়েছে। চলুন একটি একটি করে সে শিক্ষাগুলো এখন পর্যালোচনা করা যাক-

১. আল্লাহর আদেশ মানার মানসিকতা তৈরি করার শিক্ষা

একজন মুসলিমের জীবনের প্রতিটি কাজ করতে হবে আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশিত এবং রাসূল (সা.)-এর প্রদর্শিত পথে। আল্লাহর আদেশ মানার মানসিকতা তৈরী না হলে এটি সম্ভব নয়। তাই, জীবনের প্রতিটি কাজ আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশিত এবং রাসূল (সা.)-এর প্রদর্শিত পথে করার ব্যাপারে মানুষের মন-মানসিকতাকে গঠন করার জন্য সালাতে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা দেয়া হয়েছে নিম্নোক্তভাবে-

তাত্ত্বিক উপায়

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ .

অর্থ: হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর এবং শুনার পর তোমরা তা (আদেশ) থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না।

(আনফাল/৮ : ২০)

এ ধরনের বক্তব্য ধারণকারী অনেক আয়াত কুরআনে আছে। সালাত আদায়কারী যদি এ আয়াতখানি বা এ ধরনের বক্তব্য ধারণকারী যেকোন আয়াত সূরা ফাতিহার পর পড়ে তাহলে জীবনের প্রতিটি কাজ আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশিত এবং রাসূল (সা.)-এর প্রদর্শিত পথে করার বিষয়টি রিভিশন দেয়ার মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে তার স্মরণে থাকবে।

ব্যবহারিক উপায়

ব্যবহারিকভাবে এ বিষয়টি শেখানো হয়েছে সালাতের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এভাবে- সালাতের আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশিত এবং রাসূল (সা.)-এর প্রদর্শিত বিধান হলো রুকু আগে এবং সিজদা পরে করা। কোন সালাত আদায়কারী যদি সেজদা আগে এবং রুকু পরে করে তাহলে তার সালাত আদায় বা কবুল হবে না। এর মাধ্যমে সালাত আদায়কারীকে শিখিয়ে দেয়া হলো যে- জীবনের প্রতিটি কাজ আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশিত এবং রাসূল (সা.)-এর প্রদর্শিত পথে পালন করতে হবে। অন্যথায় তা আল্লাহর নিকট কবুল হবে না। অর্থাৎ তার প্রকৃত কল্যাণ দুনিয়া ও আখিরাতে পাওয়া যাবে না।

♣♣ বর্তমান বিশ্বের সালাত আদায়কারীদের জীবন পরিচালনা দেখলে সহজে বুঝা যায়- তাদের অধিকাংশই সালাত থেকে এ অতীব গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাটি নিচ্ছে না এবং বাস্তবে প্রয়োগ করছে না। অর্থাৎ তারা সালাত পড়ছেন কিন্তু কায়েম করছেন না। তাই তাদের সালাত কবুল হওয়ার বিষয়ে এক বিরাট প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

২. সর্বপ্রথম কুরআন থেকে ইসলামের জ্ঞান অর্জন করার শিক্ষা

ইসলামের একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ হলো আল কুরআন। আবার কুরআন হলো সত্যমিথ্যার পার্থক্যকারী। তাই কুরআন জানা থাকলে অন্য যেকোন গ্রন্থে থাকা ভুল

সহজে ধরা যায়- সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকহ, ইসলামী সাহিত্য, ফাজায়েলে আমল, চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রকৌশল বিজ্ঞান, অর্থ বিজ্ঞান ইত্যাদি যাই হোক না কেন।

অন্যদিকে কুরআনে ইসলামের সকল মূল বিষয় স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, কুরআনের কলেবর হাদীস ও ফিকাহ গ্রন্থের কলেবর থেকে অনেক ছোট। আর কুরআন বুঝাও খুব সহজ। তাই এটি বুঝা খুবই সহজ যে- ইসলাম জানার জন্য সর্বপ্রথম কুরআনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এ কথাটি তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকভাবে সালাত থেকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে নিম্নোক্তভাবে-

তাত্ত্বিক উপায়

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ . خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ . اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ . اَلَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ . عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ .

অর্থ: পড়ো তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন। যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন 'আলাক' (কোন স্থান থেকে ঝুলে থাকা জিনিস সদৃশ বস্তু) থেকে। পড়ো, আর তোমার প্রতিপালক মহিমান্বিত। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন কলমের সাহায্যে। শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে (এমন বিষয়সমূহ) যা সে জানতো না।

(আলাক/৯৬ : ১-৫)

ব্যাখ্যা: কুরআনের এ পাঁচখানি আয়াত প্রথম নাযিল হয়। প্রথম শব্দটি হচ্ছে 'পড়ো' তথা 'জ্ঞান অর্জন করো'। এটি আদেশমূলক কথা। তাই কুরআনের প্রথম আদেশ হলো জ্ঞান অর্জন করার আদেশ। আর জ্ঞান অর্জন করার আদেশ দেয়ার পর আল্লাহ যে ৫টি পংতি (আয়াত) পড়তে বলেছেন তা কুরআনের আয়াত। আবার যে পাঁচটি আয়াত আল্লাহ পড়তে বলেছেন সেখানে জ্ঞান অর্জন করা এবং জ্ঞান অর্জনের সাহায়তাকারী বিষয়ের কথাই শুধু বলেছেন। সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, জিহাদ, ইকামাতে দীন ইত্যাদি কোন আমলের কথা বলেননি। তাই প্রথম নাযিল হওয়ার ৫খানি আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে- দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তিতে থাকার জন্য মানুষের সর্বপ্রথম, ১ নম্বর বা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো কুরআনের জ্ঞান অর্জন করা।

এ ধরনের বক্তব্য ধারণকারী আরো আয়াত কুরআনে আছে। সালাত আদায়কারী যদি এ আয়াতখানি বা এ ধরনের বক্তব্য ধারনকারী যেকোন আয়াত সূরা ফাতিহার পর পড়ে তাহলে ইসলাম প্রথমে শিখতে হবে কুরআন অধ্যয়ন করার মাধ্যমে এ বিষয়টি রিভিশন দেয়ার মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে তার স্মরণে থাকবে।

ব্যবহারিক উপায়

ব্যবহারিকভাবে এ বিষয়টি শেখানো হয়েছে সালাতের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এভাবে- সালাতে মহান আল্লাহ শুধু কুরআন পড়তে বলেছেন। হাদীস, ফিকাহ্ গ্রন্থ, ইসলামী

সাহিত্য, বিজ্ঞানের বই, অর্থনীতির বই বা অন্য কোন গ্রন্থ পড়তে বলেননি। এর মাধ্যমে আল্লাহ শিক্ষা দিয়েছেন ইসলামকে প্রথমে জানতে হবে নির্ভুল উৎস আল-কুরআন অধ্যয়ন করে।

♣♣ বর্তমান বিশ্বের অতি অল্প সংখ্যক সালাত আদায়কারীর কুরআনের গ্রহনযোগ্য পরিমান জ্ঞান আছে। অর্থাৎ এ দৃষ্টিকোন থেকেও তারা সালাত পড়ছেন কিন্তু প্রতিষ্ঠা করছেন না। তাই এ দৃষ্টিকোন থেকেও তাদের সালাত কবুল হচ্ছে কিনা সেটি এক বিরাট প্রশ্ন।

৩. সওয়াব ও গুনাহ মাপের পদ্ধতি ও নীতিমালার শিক্ষা

পরকালে মানুষের সাওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে এবং সে মাপের ভিত্তিতে পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া হবে। ঐ মাপটি হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে। অর্থাৎ পরকালে কোন মুসলিমের আমলনামায় যদি একটি মৌলিক গুনাহ (কবীরা গুনাহ) থাকে তবে ব্যক্তির আমলনামায় থাকা সকল সাওয়াবের মাপের যোগফল শুন্য হয়ে যাবে। আর তাই তাকে চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। এ বিষয়টি তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকভাবে সালাত থেকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে নিম্নোক্তভাবে-

তাত্ত্বিক উপায়

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ .

অর্থ: আর যে (মু'মিন) ব্যক্তি (মিরাস বন্টনের ব্যাপারে) আল্লাহ ও তার রাসুলের অবাধ্য হবে এবং তার নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে তিনি তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন, সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং তার জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।

(নিসা/৪ : ১৪)

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُه فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ . وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُه فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ .

অর্থ: অতঃপর যার সওয়াবের পরিমাণ বেশি হবে তারা সফলকাম হবে। আর যাদের সওয়াবের পরিমাণ কম (শূন্য) হবে, তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। তারা চিরকাল জাহান্নামে থাকবে।

(মু'মেনুন/২৩ : ১০২, ১০৩)

এ ধরনের বক্তব্য ধারনকারী আরো আয়াত কুরআনে আছে। সালাত আদায়কারী যদি এ আয়াতগুলো বা এ ধরনের বক্তব্য ধারনকারী যেকোন আয়াত সূরা ফাতিহার পর পড়ে তবে সাওয়াব ও গুনাহ মাপার নীতিমালাটি রিভিশন দেয়ার মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে তার স্মরণে থাকবে।

ব্যবহারিক উপায়

ব্যবহারিকভাবে এ বিষয়টি শেখানো হয়েছে সালাতের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এভাবে- সালাতে ১৩টি ফরজ বিষয় আছে। কোন সালাত আদায়কারী যদি সকল ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব বিষয় এবং ১৩টি ফরজের ১২টি সঠিকভাবে আদায় করে কিন্তু একটি ফরজে ভুল করে তবে তার সালাত সম্পূর্ণ ব্যর্থ ধরা হয়। কিন্তু সালাত আদায়কারী যদি সকল ফরজগুলো সঠিকভাবে পালন করে কিন্তু সকল নফল বিষয়ে ভুল করে তবে তার সালাত আদায় হয়ে যাবে তবে তাতে সামান্য কমতি থাকবে। এখান থেকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে- পরকালে কোন মুসলিমের আমলনামায় যদি একটি মৌলিক গুনাহ (কবীরা গুনাহ) থাকে তবে ব্যক্তির আমলনামায় থাকা নেকীর মাপের যোগফল শূন্য হয়ে যাবে। অর্থাৎ সাওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে গুরুত্বের ভিত্তিতে। ভরের ভিত্তিতে নয়।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'আমল মাপার পদ্ধতি। প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য'** নামের বইটিতে।

♣♣ বর্তমান বিশ্বের প্রায় সব সালাত আদায়কারী বিশ্বাস করে যে- সাওয়াব ও গুনাহ মাপা হবে ভরের ভিত্তিতে দাঁড়িপাল্লায়। তাই আমল নামায় থাকা বিন্দু পরিমান সওয়াবের পুরস্কার পাওয়া যাবে এবং বিন্দু পরিমান গুনাহর জন্য শাস্তি পেতে হবে। আর তাই আমলনামায় কিছু সাওয়াব ও কিছু গুনাহ থাকা মু'মিন প্রথমে কিছুকাল জাহান্নামে থাকবে তারপর অনন্তকালে জন্য বেহেশত পেয়ে যাবে। অর্থাৎ বর্তমান বিশ্বের প্রায় সব সালাত আদায়কারীগণ সালাত থেকে দেয়া সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতির শিক্ষাটি গ্রহন করছেন না। তাই, এ দৃষ্টিকোন থেকেও তারা সালাত পড়ছেন কিন্তু কায়েম করছেন না। আর তাই এ দৃষ্টিকোন থেকেও তাদের সালাত কবুল হওয়ার বিষয়ে বিরাট প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

৪. সময় জ্ঞানের শিক্ষা

জীবনের প্রতিটি কাজ সময়মত পালন করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করার পর ঐ কাজ করার কোন মূল্য পাওয়া যায় না। এ বিষয়টি তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকভাবে সালাত থেকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে নিম্নোক্তভাবে-

তাত্ত্বিক উপায়

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.

অর্থ: অবশ্যই আল্লাহ সেসব লোকের তাওবা কবুল করেন যারা জাহালাত (ভুল, লোভ, লালসা ইত্যাদি) বশত মন্দ কাজ করে এবং অনতিবিলম্বে তাওবা করে, এদের তাওবাই আল্লাহ কবুল করেন; আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাবান। আর তাওবা তাদের জন্য নয় (তাদের তাওবা কবুল হবে না) যারা গুনাহর কাজ করে যেতে থাকে যতোক্ষণ না মৃত্যু উপস্থিত হয়, (তখন) বলে, নিশ্চয় আমি এখন তাওবা করছি এবং তাদের জন্যেও নয় যাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়; তাদের জন্য আমরা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি (জাহান্নাম) প্রস্তুত রেখেছি।

(নিসা/৪ : ১৭, ১৮)

ব্যাখ্যা: তাওবা ইসলামের একটি আমল। এ আয়াত দু'খানির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে তাওবা কবুল হওয়ার একটি নির্দিষ্ট সময় আছে। ঐ সময় পার হয়ে গেলে তাওবা নামের অতীব গুরুত্বপূর্ণ আমলটির কোন কল্যাণ পাওয়া যায় না।

এ ধরনের বক্তব্য ধারনকারী আরো আয়াত কুরআনে আছে। সালাত আদায়কারী যদি এ আয়াতখানি বা এ ধরনের বক্তব্য ধারনকারী যে কোন আয়াত সূরা ফাতিহার পর পড়ে তাহলে জীবনের প্রতিটি কাজ সময়মত পালন করতে হবে এবং নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম করার পর ঐ কাজ করার কোন মূল্য পাওয়া যায় না, এ বিষয়টি রিভিশন দেয়ার মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে তার স্মরণে থাকবে।

ব্যবহারিক উপায়

পাঁচ ওয়াক্ত সালাত একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদায় করতে হয়। এই সময় বেঁধে দিয়ে আল্লাহ মুসলমানদের সময়জ্ঞানের শিক্ষা দিয়েছেন।

♣♣ বর্তমান বিশ্বের সালাত আদায়কারী ব্যক্তিদের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় তাদের সময়জ্ঞানের দারুন অভাব। তাই, এ দৃষ্টিকোন থেকেও তারা সালাত পড়ছেন কিন্তু কায়েম করছেন না। আর তাই এ দৃষ্টিকোন থেকেও তাদের সালাত কবুল হওয়ার বিষয়ে বিরাট প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

৫. পর্দা করার শিক্ষা

পর্দা করা ইসলামের একটি ফরজ বিধান এবং এতে নানাধরনের কল্যাণ আছে। এ বিষয়টি তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকভাবে সালাত থেকে শেখানো হয়েছে নিম্নোক্তভাবে-

তাত্ত্বিক উপায়

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا

অর্থ: হে বনী আদম! আমরা তোমাদের জন্য পোশাক (তৈরীর জ্ঞান) অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমারা লজ্জাস্থানকে আবৃত করতে পারো এবং (যা) সৌন্দর্যবর্ধক একটি বিষয়।

(আ'রাফ/৭ : ২৬)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ

অর্থ: হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের, কন্যাদের এবং মু'মিনদের স্ত্রীদের বলো- তারা যেনো তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের (শবীরের) উপর ঝুলিয়ে দেয়; এতে তাদেরকে চেনা সহজতর হবে, ফলে তাদের উত্যক্ত করা হবে না।

(আহযাব/৩৩ : ৫৯)

এ ধরনের বক্তব্য ধারনকারী আরো আয়াত কুরআনে আছে। সালাত আদায়কারী যদি এ আয়াতখানি বা এ ধরনের বক্তব্য ধারনকারী যেকোন আয়াত সূরা ফাতিহার পর পড়ে তাহলে পর্দা করার বিষয়টি রিভিশন দেয়ার মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে তার স্মরণে থাকবে।

ব্যবহারিক উপায়

পর্দা করার বিষয়টি ব্যবহারিকভাবে শেখানো হয়েছে সালাতের অনুষ্ঠানটি করার সময় সতর ঢাকার বিধানকে বাধ্যতামূলক করার মাধ্যমে।

♣♣ বর্তমান বিশ্বের মুসলিম নারীদের মধ্যে পর্দার বিষয়টি ভীষণভাবে উপেক্ষিত। তাই, যে সকল মুসলিম মহিলা সালাত আদায় করছেন কিন্তু যথাযথভাবে পর্দা করছেন না, পর্দার দৃষ্টিকোন থেকে তারা সালাত পড়ছেন কিন্তু কায়েম করছেন না। আর তাই তাদের সালাত কবুল হচ্ছে কি হচ্ছে না এটি একটি বড় চিন্তার বিষয়।

৬. শরীর-স্বাস্থ্য সুস্থ্য সবল রাখার শিক্ষা

শরীর-স্বাস্থ্য সুস্থ্য থাকা মানুষে দুনিয়ার জীবনের শান্তির জন্য অপরিহার্য। তাই, এ বিষয়টি তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকভাবে সালাত থেকে শেখানো হয়েছে নিম্নোক্তভাবে-

তাত্ত্বিক উপায়

শরীর-স্বাস্থ্য সুস্হ সবল রাখার বিষয়টি বিভিন্ন ধরনের বক্তব্যের মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে কুরআন জানিয়ে দিয়েছে। কুরআন শুধু রোগ প্রতিরোধ বিষয়ক বিভিন্ন আদেশ, নিষেধ, উপদেশ ও তথ্য উল্লেখ করেছে। আর রোগ নিরাময়মূলক চিকিৎসা গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার করে কাজে লাগাতে বলেছে। কুরআনে উল্লেখ থাকা রোগ প্রতিরোধমূলক বহু বক্তব্যের একটি হলো সূরা মায়েদার ৬নং আয়াত যা পূর্বে (পৃষ্ঠা নং ২৭) উল্লেখ করা হয়েছে।

সালাত আদায়কারী যদি রোগ প্রতিরোধমুলক বক্তব্য ধারনকারী যেকোন আয়াত সূরা ফাতিহার পর পড়ে তাহলে শরীর-স্বাস্থ্য সুস্হ সবল রাখার বিষয়টি রিভিশন দেয়ার মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে তার স্মরণে থাকবে।

ব্যবহারিক উপায়

সালাতের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শরীর-স্বাস্থ্য সুস্থ সবল রাখার বিষয়টি ব্যবহারিকভাবে শেখানো হয়েছে দুভাবে-

ক. সালাতের অনুষ্ঠানের বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ ও জায়গা (পরিবেশ) পাক তথা পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা

এ শর্তের কারণে প্রত্যেক সালাত আদায়কারী তার শরীর, পোশাক-পরিচ্ছদ ও পরিবেশ ঘন ঘন ধোয়া-মোছার মাধ্যমে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে বাধ্য হয়। আর এর ফলে তারা বিভিন্ন ধরনের রোগ থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

খ. সালাতে বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি (Movement) তথা ব্যায়ামের বিষয়টি বাধ্যতামূলক হিসেবে রাখা

সিজদা হচ্ছে সালাতের মধ্যে আল্লাহর সবচেয়ে পছন্দের অবস্থান। তাই আল্লাহর সালাতের সময় শুধু সিজদায় থেকে দোয়া কালাম পড়ে সালাত শেষ করতে বলা বেশি যৌক্তিক ছিল। কিন্তু তা না করে তিনি হাত উঠিয়ে তাকবীরে তাহরীমা, মেরুদণ্ড বাঁকিয়ে ও ভাজ করে রুকু ও সিজদা এবং ঘাড় ফিরিয়ে সালাম ফেরানোর মাধ্যমে সালাত আদায় করতে বলেছেন। এখান থেকে বুঝা যায়, সালাতের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গির একটা শিক্ষা হচ্ছে শরীর চর্চার (ব্যায়াম) শিক্ষা। আর শরীর চর্চার সময় কী কী অঙ্গভঙ্গির দিকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ তা শিক্ষা দিয়েছেন।

বর্তমান চিকিৎসা বিদ্যার একটি প্রতিষ্ঠিত বিষয় হলো- নিয়মিত ব্যায়াম করলে মানুষের বিভিন্ন কঠিন রোগ যেমন- ডায়বিটিস, হাই প্রেসার, হার্টের রোগ ইত্যদি কম হয়। সালাত থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে বাস্তবে তা সালাত আদায়কারীরা পালন করুক, এটিই আল্লাহ চান। মুসলমানরা যদি ব্যায়ামের সময় কী ধরনের অঙ্গভঙ্গি করতে হবে সালাত থেকে ঐ শিক্ষাগুলো নিয়ে বাস্তবে প্রতিদিন ঐভাবে কিছুক্ষণ ব্যায়াম করে তবে তাদের অনেক রোগ-ব্যাধি কম হবে।

এখন প্রশ্ন থাকে যে, কী কারণে আল্লাহ মুসলমানদের সালাতের মাধ্যমে এভাবে শরীর সুস্থ্য-সবল রাখার শিক্ষা দিলেন। শরীর-স্বাস্থ্য সুস্থ্য থাকা মানুষে দুনিয়ার জীবনের শান্তির জন্য অপরিহার্য এটি সহজে বুঝা যায়। তবে এর অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো- ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য (আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা) বাস্তবায়ন করা। এটি করতে গেলে মুসলিমদের জরা-জীর্ণ শরীরের অধিকারী হলে চলবে না। কারণ, ঐ কাজ করতে তাদের কঠোর প্রতিরোধের মুকাবেলা করতে হবে। তাই তাদের অবশ্যই সুস্থ্য-সবল স্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে। আর তাই সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ মুসলিমদের শরীর-স্বাস্থ্য, সুস্থ্য-সবল রাখার এই অপূর্ব শিক্ষা দিয়েছেন।

♣♣ বর্তমানে সালাত আদায়কারীগণের খুব কম সংখ্যকই সালাতের বাইরে নিয়মিত ব্যায়াম করেন। তাই, এ দৃষ্টিকোন থেকেও তারা সালাত পড়ছেন যথাযথভাবে কায়েম করছেন না।

সমাজ জীবনের প্রধান শিক্ষাগুলো তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ভাবে সালাত থেকে যেভাবে দেয়া হয়েছে

মানুষ সামাজিক জীব। সুশৃঙ্খল ও সমাজবদ্ধ মানবজীবন আধুনিক সভ্যতার পূর্বশর্ত। তাই মানুষ গড়ার প্রোগ্রামে যদি সুষ্ঠু সমাজবদ্ধ জীবন গড়ার শিক্ষা না থাকে, তবে অবশ্যই সেই প্রোগ্রাম অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আল্লাহর মানুষ গড়ার প্রোগ্রাম অসম্পূর্ণ থাকতে পারে না। তাই মুসলিমরা কিভাবে তাদের সমাজ জীবন পরিচালনা করবে তার অপূর্ব শিক্ষা তিনি সালাতের মাধ্যমে দিয়েছেন। আর এ শিক্ষা আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন জামায়াতে সালাত আদায় করার বিধান দেয়ার মাধ্যমে।

ব্যক্তি জীবনের শিক্ষার ন্যায় সমাজ জীবনের শিক্ষাগুলোও তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় উপায়ে সালাত থেকে দেয়া হয়েছে। তাত্ত্বিকভাবে এ শিক্ষাগুলো দেয়া হয়েছে দু'ভাবে-

১. সামগ্রিকভাবে জামায়াতে সালাত আদায় করার আদেশ দেয়া ও গুরুত্ব জানানোর মাধ্যমে
২. প্রতিটি শিক্ষার আদেশ বা গুরুত্ব আলাদাভাবে জানানোর মাধ্যমে

প্রথমে আমরা জামায়াতে সালাত আদায় করার আদেশ ও গুরুত্বের বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে থাকা তথ্যগুলো দেখে নিবো। আর প্রতিটি শিক্ষার বিষয়ে কুরআনের সুনির্দিষ্ট শিক্ষা ঐ শিক্ষাটি আলোচনা করার সময়ে উপাস্থাপন করা হবে।

জামায়াতে সালাত আদায় করার আদেশ ও গুরুত্বের বিষয়টি তাত্ত্বিকভাবে কুরআন ও হাদীসে যেভাবে উপস্থিত আছে

আল কুরআন

আল কুরআনের দু'টি স্থানে জামায়াতে সালাত আদায় করার কথাটি বা আদায় করার গুরুত্ব নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করা হয়েছে-

وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.

অর্থ: রুকুকারীগণের সাথে রুকু (জামায়াতের সঙ্গে সালাত আদায়) করো।

(বাকারা/২ : ৪৩)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.

অর্থ: অর্থ: হে যারা ঈমান এনেছো! জুমু'আর দিনে যখন সালাতের জন্য আহ্বান

করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর যিক'রের দিকে (সালাতের দিকে) দৌড়াও এবং বেচা-কেনা পরিত্যাগ করো; এটাই তোমাদের জন্য (অধিক) উত্তম যদি তোমরা জানতে।

(জুম'আ/৬২ : ৯)

ব্যাখ্যা: আয়াতে কারীমার ব্যাখ্যা ৩০ নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে।

আল হাদীস

জামায়াতে সালাত পড়ার গুরুত্ব বর্ণনাকারী অনেক হাদীস আছে। তার মধ্যকার একটি হলো এরূপ-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ، فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلاَةِ، فَيُؤَذَّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ، فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ، أَنَّهُ يَجِدُ عَرْقًا سَمِينًا، أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ، لَشَهِدَ الْعِشَاءَ

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (সা.) বলেছেন- যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি, আমি মনস্থ করেছি যে- কিছু জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করার নির্দেশ দেব। তা সংগ্রহ করা হবে অতঃপর আমি সালাতের ব্যবস্থা করার আদেশ দেব। আযান দেয়া হবে এরপর একজনকে সালাতের ইমামতি করার নির্দেশ দেব। এমতবস্থায় আমি লোকদের বাড়ি বাড়ি যাব এবং যারা সালাতে আসেনি তাদের বাড়ি-ঘরগুলো জ্বালিয়ে দেব। যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম করে বলছি- যদি কেউ জানতে পারে যে সে ছাগলের একটি মাংসল হাড় অথবা দুটি ভালো খুর পাবে তাহলে সে অবশ্যই এশার নামাজের জামায়াতে হাজির হবে।
(বুখারী, আযান অধ্যায়, জামাতে সালাত আদায় করা ওয়াজিব পরিচ্ছেদ, মাকতাবাতুস সাফা, মিশর, ২০১৩, হাদীস নং- ৬৪৪, পৃষ্ঠা- ৮৫)

♣♣ কুরআন ও হাদীসের এ সকল বক্তব্য থেকে অতি সহজে বুঝা যায়- ইসলাম জামায়াতে সালাত পড়াকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কাজ বন্ধ রেখে জামায়াতে সালাত পড়তে আসা অধিক কল্যাণকর। এ কথাটি যে কত বড় সত্য তা অতি সহজে বুঝা যাবে জামায়াতে সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ যে শিক্ষাগুলো দিতে চেয়েছেন সেগুলো জানার পর। তখন আমরা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করতে বাধ্য হব- যে সমাজে ঐ শিক্ষাগুলোর বাস্তব

প্রয়োগ নেই সেখানে মানুষের যতই টাকা-পয়সা, ব্যবসা-বাণিজ্য থাকুক না কেন সামাজিক শান্তি বলতে কিছুই থাকতে পারে না।

সমাজ জীবনের প্রধান শিক্ষাগুলো তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উপায়ে সালাত থেকে যেভাবে দেয়া হয়েছে

১. পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, ভালবাসা ইত্যাদি সৃষ্টি হওয়ার শিক্ষা

যে সমাজের সদস্যদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, ভালবাসা, সহমর্মিতা, স্নেহ, শ্রদ্ধা ইত্যাদি নাই সে সমাজে শান্তি থাকতে পারে না। তাই, এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকভাবে সালাত থেকে শেখানো হয়েছে নিম্নোক্তভাবে-

তাত্ত্বিক উপায়

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

অর্থ: নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পরের ভাই।

(হুজুরাত/৪৯ : ১০)

ব্যাখ্যা: 'নিশ্চয়ই মুমিনরা পরস্পরের ভাই' কথাটির মাধ্যমে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, এক ভাইয়ের অন্তরে অন্য ভাইয়ের জন্যে যেমন সহানুভূতি, সহমর্মিতা, স্নেহ-শ্রদ্ধা, ভালবাসা ইত্যাদি থাকে, একজন মুমিনের অন্তরেও ঠিক অন্য মুমিনের জন্যে অনুরূপ অনুভূতি থাকবে।

রাসূল (সা.) বলেছেন, মুসলিমদের সমাজ একটি দেহের মত। দেহের কোথাও কোন ব্যথা বা কষ্ট হলে সমস্ত দেহে তা অনুভূত হয়। আবার দেহের কোথাও সুখ অনুভূত হলে তাও সমস্ত শরীরে অনুভূত হয়। মুসলিমদের সমাজও হতে হবে অনুরূপ। অর্থাৎ তাদের সমাজেরও কোন ব্যক্তির উপর কোন দু:খ-কষ্ট আসলে সমাজের সকলের উপর তার ছাপ পড়তে হবে এবং সবাইকে সেটি দূর করারও চেষ্টা করতে হবে। আবার সমাজের কারো কোন সুখের কারণ ঘটলেও সমাজের সকলের উপর তার ছাপ পড়তে হবে।

এ ধরনের বক্তব্য ধারনকারী আরো আয়াত কুরআনে আছে। সালাত আদায়কারী যদি এ আয়াতখানি বা এ ধরনের বক্তব্য ধারণকারী যেকোন আয়াত বা জামায়াতে সালাতের আদেশ ও গুরুত্ব বর্ণনকারী যেকোন আয়াত, সূরা ফাতিহার পর পড়ে তাহলে পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, ভালবাসা ইত্যাদি সৃষ্টি হওয়ার বিষয়টি রিভিশন দেয়ার মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে তার স্মরণে থাকবে।

ব্যবহারিক উপায়

মু'মিনরা পরস্পরের ভাই কথাটি কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েই আল্লাহ ছেড়ে দেননি। ভাইয়ের অন্তরে ভাইয়ের জন্যে যেমন স্নেহ-শ্রদ্ধা, মমতা, ভালবাসা, সহমর্মিতা ইত্যাদি থাকে মুসলমানদের সমাজের সদস্যদের পরস্পরের অন্তরেও

অনুরূপ গুণাবলী সৃষ্টি করার জন্যে, তিনি বাস্তব ব্যবস্থা দিয়েছেন। সে ব্যবস্থা হলো 'জামায়াতে সালাত'।

এ কথা সবাই স্বীকার করবেন যে, পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎ, ওঠা-বসা যত বেশি হয় ততোই একজনের প্রতি আর একজনের মায়া-মহব্বত, স্নেহ-মমতা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা ইত্যাদি বেশি হয়। আর তা না হলে ঐ সবগুলো বিষয়ই ধীরে ধীরে কমে যায় (Out of sight out of mind)। জামায়াতে সালাত মুসলমানদের সমাজের একজনের সঙ্গে আর একজনের সেই দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। জামায়াতে সালাত প্রতিদিন পাঁচবার নিজ এলাকার লোকদের সঙ্গে, প্রতি সপ্তাহে একবার (জুম'আর সালাত) আরো একটু বড় এলাকার লোকদের সঙ্গে এবং প্রতি বছর দু'বার (ঈদের সালাত) আরো একটু বড় এলাকার লোকদের সঙ্গে এবং প্রতি বছর একবার (হজ্জের সময়) সমস্ত পৃথিবীর সচ্ছল মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে দেখা-সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছে। কী অপূর্ব ব্যবস্থা! অন্য কোন জীবন ব্যবস্থায় সমাজের সদস্যদের পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, ভালবাসা তৈরি করার এমন অপূর্ব সুন্দর ব্যবস্থা আছে কি?

♣♣ বর্তমানে সালাত আদায়কারী মুসলিম সমাজের সদস্যদের পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব, ভালবাসা, সহমর্মিতা, স্নেহ, শ্রদ্ধা ইত্যাদি খুবই অপ্রতুল। তাই, এ দৃষ্টিকোন থেকে তারা সালাত পড়ছেন কিন্তু যথাযথভাবে কায়েম করছেন না। আর তাই এ দৃষ্টিকোন থেকে তাদের সালাত কবুল হওয়ার বিষয়ে বিরাট প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

২. সামাজিক সাম্য তৈরির শিক্ষা

একটি সমাজে সুখ-শান্তির জন্য সামাজিক সাম্য থাকা এবং অহংকার না থাকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকভাবে সালাত থেকে শেখানো হয়েছে নিম্নোক্তভাবে-

তাত্ত্বিক উপায়

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ

অর্থ: হে মানুষ! নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন নারী ও একজন পুরুষ থেকে, অতঃপর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো; নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক আল্লাহ-সচেতন।

(হুজুরাত/৪৯ : ১৩)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ এখানে বলছেন- তিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন একজন পুরুষ ও একজন মহিলা থেকে। এরপর তিনি তাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছেন। তবে এই বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করার পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য সম্মান ও মর্যাদা

নির্ণয় করা নয়। এর পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য হলো- পরস্পরকে সহজে চেনার ব্যবস্থা করা। এরপর আল্লাহ বলেছেন, তাঁর নিকট মানুষের সম্মান-মর্যাদার মাপকাঠি হচ্ছে আল্লাহ সচেতনতা। আল্লাহ সচেতনতা বলতে কি বুঝায় তা পরে (৫৩ পৃষ্ঠা) আসছে।

তাই, এ আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে- মানব জাতিকে বিভিন্ন বংশ ও গোত্রে বিভক্ত করার কারণ হলো একে অপরকে চেনার ব্যবস্থা করা। এটি মর্যাদার মাপকাঠি নয়। অর্থাৎ বংশ, জাতি, ধনী-গরীব, কালো-সাদা, মনিব-চাকর, ধনী, গরীব ইত্যাদি মানুষের মর্যাদাশীল হওয়ার মাপকাঠি নয়। আল্লাহর নিকট মর্যাদাশীল হওয়ার মাপকাঠি হলো আল্লাহ সচেতনতা।

এ ধরনের বক্তব্য ধারনকারী আরো আয়াত কুরআনে আছে। সালাত আদায়কারী যদি এ আয়াতখানি বা এ ধরনের বক্তব্য ধারনকারী যেকোন আয়াত বা জামায়াতে সালাতের আদেশ ও গুরুত্ব বর্ণনকারী যেকোন আয়াত, সূরা ফাতিহার পর পড়ে তাহলে সামাজিক সাম্য তৈরির বিষয়টি রিভিশন দেয়ার মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে তার স্মরণে থাকবে।

ব্যবহারিক উপায়

বংশ, জাতি, গায়ের রং, ধনী-গরীব, কালো-সাদা, মনিব-চাকর ইত্যাদি নিয়ে মানব সমাজে যেন অহংকার সৃষ্টি না হতে পারে, সে জন্যে মহান আল্লাহ কর্মপদ্ধতিও তৈরি করে দিয়েছেন। সেই কর্মপদ্ধতি হচ্ছে জামায়াতে সালাত আদায় করা। একজন মুসলমান দিনে পাঁচবার জামায়াতে সালাতের সময় তার বংশ, ভাষা, গায়ের রং, অর্থনৈতিক, সামাজিক ইত্যাদি পরিচয় ভুলে গিয়ে অন্য মুসলমান ভাইয়ের সঙ্গে এক লাইনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে যায়। এ সময় মনিবের পাশেই তাঁর খাদেম দাঁড়াতে পারে বা মনিবের মাথা যেয়ে লাগতে পারে সামনের কাতারে দাঁড়ানো তাঁর গাড়ীর চালকের পায়ের গোড়ালিতে। এভাবে দিনে পাঁচবার বাস্তব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মুসলমানদের অন্তর থেকে বংশ, বর্ণ, ভাষা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিচয়ভিত্তিক অহংকার সমূলে দূর করার অপূর্ব ব্যবস্থা করা হয়েছে। সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার এমন অপূর্ব প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা খুঁজে পাবেন কি অন্য কোন জীবন ব্যবস্থায়?

♣♣ বর্তমান মুসলিম সমাজে সামাজিক সাম্যের বিষয়টি বেশ উপেক্ষিত। তাই, দৃষ্টিকোন থেকে তারা সালাত পড়ছেন কিন্তু কায়েম করছেন না। আর তাই এ দৃষ্টিকোন থেকেও তাদের সালাত কবুল হওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

৩. দলবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করার শিক্ষা

ছোট কাজ একা করা সম্ভব। কিন্তু বড় কোন কাজ করতে হলে দলবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলভাবে কাজটি করার গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো- আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায় কাজের বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা। এ উদ্দেশ্য বস্তবায়ন

করতে হলে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। দলবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলভাবে চেষ্টা করা ছাড়া ঐ কাজে সফল হওয়া অসম্ভব। হজরত ওমর (রা.) তাই বলেছেন, জামায়াতবিহীন ইসলাম নেই, নেতাবিহীন জামায়াত নেই। তাই, এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকভাবে সালাত থেকে শেখানো হয়েছে এভাবে-

তাত্ত্বিক উপায়

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُو

অর্থ: তোমরা দলবদ্ধভাবে আল্লাহর রুজ্জুকে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না।

(আল ইমরান/৩ : ১০৩)

এ ধরনের বক্তব্য ধারনকারী আরো আয়াত কুরআনে আছে। সালাত আদায়কারী যদি এ আয়াতখানি বা এ ধরনের বক্তব্য ধারনকারী যেকোন আয়াত বা জামায়াতে সালাতের আদেশ ও গুরুত্ব বর্ণনকারী যেকোন আয়াত, সূরা ফাতিহার পর পড়ে তাহলে দলবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করার গুরুত্ব ও পদ্ধতির বিষয়টি রিভিশন দেয়ার মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে তার স্মরণে থাকবে।

ব্যবহারিক উপায়

দলবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করার অপূর্ব শিক্ষা ব্যবহারিকভাবে দেয়া হয়েছে জামায়াতে সালাত আদায় করার মাধ্যমে। হাজার হাজার মুসলিমও যদি জামায়াতে দাঁড়ায়, তবুও দেখবেন, সোজা লাইনে দাঁড়িয়ে কী অপূর্ব শৃঙ্খলার সঙ্গে তারা একটি কাজ করছে। এর মাধ্যমে আল্লাহ মুসলিমদের শিক্ষা দিয়েছেন যে- তারা যেন তাদের জীবনের সকল বড় কাজ দলবদ্ধ ও সুশৃঙ্খলভাবে পালন করে।

♣♣ বর্তমান বিশ্বের মুসলিমরা নানা দলে বিভক্ত। তাদের সমাজে শৃঙ্খলারও দারুণ অভাব। তাই, দৃষ্টিকোন থেকেও তাদের সালাত পড়া হচ্ছ। কায়েম করছেন না। আর তাই এ দৃষ্টিকোন থেকেও তাদের সালাত কবুল হচ্ছে কিনা সেটি এক বিরাট প্রশ্ন।

৪. সমাজ পরিচালনা পদ্ধতির শিক্ষা

মানব সমাজের সুখ, শান্তি, উন্নতি, প্রগতি ইত্যাদি নির্ভর করে সুষ্ঠুভাবে সমাজ (দেশ) পরিচালনার ওপর। তাই সমাজ পরিচালনা পদ্ধতির শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজ পরিচালনার মূল বিষয়গুলো হলো-

- নেতা নির্ধারণ করা
- নেতা হওয়ার যোগ্যতা
- নেতা নির্বাচন পদ্ধতি
- নেতার সমাজ বা দেশ পরিচালনা পদ্ধতি
- নেতার আনুগত্য পদ্ধতি
- নেতার অপসারণ পদ্ধতি

- মহিলা নেতা না পুরুষ নেতা

প্রথমে আমরা সমাজ পরিচালনা বিষয়ক এ মূল বিষয়গুলো সম্পর্কে কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য জানবো। তারপার সালাত থেকে ঐ শিক্ষাগুলো কিভাবে দেয়া হয়েছে তা জানবো।

সমাজ পরিচালনা পদ্ধতির মূল বিষয়গুলো সম্পর্কে আল কুরআন

সমাজের নেতা সম্পর্কিত উপরোক্ত বিষয়গুলো কুরআন জানিয়েছে সারমর্ম আকারে। আর রাসূল (সা.) তাঁর সুন্নাহ তথা কথা ও কাজের মাধ্যমে সেগুলোকে ব্যাখ্যা করে জানিয়ে দিয়েছেন। সমাজের নেতা সম্পর্কিত কুরআনের সারমর্মমূলক কয়েকটি বক্তব্য হলো-

১. নেতা নির্ধারণ করা এবং নেতা হওয়ার যোগ্যতার বিষয়ে কুরআন

তথ্য-১

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا .....

অর্থ: নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারের নিকট প্রত্যার্পণ করতে (যথাযথভাবে ফেরত্ দিতে) ... ...

(নিসা/৪ : ৫৮)

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ এখানে সকল ধরনের আমানত যোগ্য ব্যক্তিদের উপর অর্পণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। মানুষের কাছে গচ্ছিত থাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ আমানত হলো নেতৃত্বের আমানত। তাই, এ আয়াতের দু'টি নির্দেশ হলো-

- সমাজের সবাই মিলে একজনকে নেতা নির্ধারণ করতে হবে
- সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তিকে নেতা বানাতে হবে।

তথ্য-২

يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

অর্থ: হে মানুষ! নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন নারী ও একজন পুরুষ থেকে, অতঃপর তোমাদের বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে যাতে তোমরা একে অপরকে চিনতে পারো; নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে তোমাদের মধ্যে অধিক আল্লাহ-সচেতন।

(হুজুরাত/৪৯ : ১৩)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ এখানে বলছেন- তিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন একজন পুরুষ ও একজন মহিলা থেকে। এরপর তিনি তাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছেন। তবে এই বিভক্ত করার পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য সম্মান ও মর্যাদা নির্ণয় করা নয়। এর

পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য হলো- পরস্পরকে সহজে চেনার ব্যবস্থা করা। শেষে আল্লাহ বলেছেন, তাঁর নিকট মানুষের সম্মান-মর্যাদার মাপকাঠি হচ্ছে আল্লাহ সচেতনতা।

স্বাস্থ্য সচেনতা বলতে বুঝায় স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় জানা ও মানা। তাই, আল্লাহ সচেনতা বলতে বুঝাবে আল্লাহ সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয় জানা ও মানা। আল্লাহ সম্পর্কে জানার মূল গ্রন্থ হলো কুরআন। সুন্নাহ (হাদীস) কুরআনের ব্যাখ্যা, তবে কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো কুরআন। তাই আল্লাহ সচেতনতা বলতে বুঝাবে- কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান থাকা এবং সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা। আর তাই এ আয়াত থেকে জানা যায়- কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান এবং সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করার দিক দিয়ে যে যতো এগিয়ে থাকবে মর্যাদা দিক দিয়ে সে ততো এগিয়ে যাবে।

যোগ্যতাই এনে দেয় সম্মান-মর্যাদা। তাই এ আয়াতের শিক্ষা হলো- কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান এবং সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল যার বেশি থাকবে ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে সেই হবে অধিক যোগ্য ব্যক্তি।

সম্মিলিত শিক্ষা: ১নং তথ্যের আয়াতখানির মাধ্যমে জানানো হয়েছে যোগ্য ব্যক্তিকে নেতা বানাতে হবে। আর ২ নং তথ্যের আয়াতখানির বক্তব্য হলো- কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান এবং সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল যার বেশি থাকবে ইসলামী দৃষ্টিকোন থেকে সেই হবে অধিক যোগ্য ব্যক্তি। তাই এ দু'খানি আয়াতের আলোকে বলা যায়- কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান এবং সে অনুযায়ী আমল যার বেশি থাকবে সেই হবে মুসলিম সমাজের নেতা হওয়ার অধিক যোগ্য ব্যক্তি। এ বিষয়ে হাদীস ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরে আসছে।

২. নেতা নির্ণয় পদ্ধতির বিষয়ে কুরআন

তথ্য-১

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

অর্থ: সুতরাং তুমি তাদেরকে মাফ করে দাও, তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং কাজে-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করো।

(আলে ইমরান/৩ : ১৫৯)

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ এ আয়াতে রাসূল (সা.)কে সাহাবীগণের সাথে পরামর্শের ভিত্তিতে কার্যসম্পাদন করতে বলেছেন। পরামর্শের ভিত্তিতে কার্যসম্পাদন করতে বলার অর্থ হলো- পরামর্শ করে সকলের বা অধিকাংশের সম্মতির ভিত্তিতে তথা ভোটের ভিত্তিতে কাজ করা।

নবুয়াতী দায়ীত্ব পালন করার সময় রাসূল (সা.) আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কথা বলতেন না। তাই, কার্যসম্পাদনের সময় রাসূল (সা.)-এর সাহাবায়েকিরামগণের সথে পরামর্শ না করলেও অসুবিধা ছিল না। তারপরও আল্লাহ তা'য়ালা রাসূল

(সা.)কে এ আদেশ দিয়েছেন। কারণ, বিষয়টি সমাজ পরিচালনার জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সমাজের নেতা নির্ধারণ করা একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাই এ আয়াতের আলোকে বলা যায়- সকল বা অধিকাংশের সম্মতি তথা ভোটের ভিত্তিতে সমাজের নেতা নির্বাচন করতে হবে।

তথ্য-২

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

অর্থ: আর যারা (প্রকৃত মু'মিনগণ) তাদের প্রতিপালকের ডাকে সাড়া দেয়, সালাত কায়েম করে; পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে নিজেদের কাজ-কর্ম সম্পাদন করে; আর তাদের আমরা যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।

(আল শুরা/৪২ : ৩৮)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতখানির একটি বক্তব্য হলো- প্রকৃত মু'মিনগণ পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে নিজেদের কাজ-কর্ম সম্পাদন করে। তাই ১নং তথ্যের আয়াতখানির ন্যায় ব্যাখ্যা করে এ আয়াত থেকেও জানা যায়- সকলের বা অধিকাংশের সম্মতি তথা ভোটের ভিত্তিতে সমাজে নেতা নির্বাচন করতে হবে।

সম্মিলিত শিক্ষা: এ দু'খানি আয়াতের আলোকে বলা যায়- মুসলিম সমাজের নেতা হবে সেই ব্যক্তি, যাকে সকল বা অধিকাংশ মু'মিন ব্যক্তি কুরআন ও সুন্নাহর জানিয়ে দোয়া যোগ্যতার দিক দিয়ে তথা কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞান এবং সে অনুযায়ী আমলের দিক দিয়ে অধিক যোগ্য বলে সম্মতি তথা ভোট দিবে।

৩. নেতার দেশ পরিচালনা পদ্ধতির বিষয়ে কুরআন

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

অর্থ: আমরা যদি তাদেরকে (মু'মিনদেরকে) পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করি (বিজয়ী করি/শাসন ক্ষমতা দেই) তবে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে (আদায় করবে), সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজে বাধা প্রদান করবে।

(হাজ্জ/২২ : ৪১)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে বলা হয়েছে মু'মিনগণ যদি পৃথিবীতে শাসন ক্ষমতা পায় তবে তারা যে সকল কাজ করবে তা হলো- সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং সৎকাজের আদেশ দেয়া ও অসৎকাজ প্রতিরোধ করা। সালাত কায়েম করার অর্থ হলো- সালাতের অনুষ্ঠান নিয়ম-কানুন মেনে নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি

অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠা করা।

পূর্বে উল্লেখিত সূরা নিসার ৫৮ নং আয়াতখানিতে জানানো হয়েছে মু'মিনগণ তাদের নেতৃত্বের আমানাত যোগ্য শাসকের হাতে অর্পন করবে। তাই এ আয়াতে বর্ণিত কাজগুলো মুসলিম দেশের শাসকের উপর বর্তাবে। অর্থাৎ মুসলিম দেশের নেতার দেশ চালাতে হবে সালাতের অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষার আলোকে।

৪. নেতার মহিলা বা পুরুষ হওয়ার বিষয়ে কুরআন

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ

অর্থ: পুরুষরা নারীদের পরিচালক, কারণ আল্লাহ তাদের একজনকে অন্য জনের উপর (বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে) শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এজন্যও যে, তারা নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে।

(নিসা/৪ : ৩৪)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ এখানে স্পষ্ট করে বলেছেন যে- পুরুষ হচ্ছে নারীর পরিচালক তথা নেতা। এরপর তিনি এর কারণও বলে দিয়েছেন। ঐ কারণের প্রধানটি হলো- জীবনের কিছু দিকে নারীরা পুরুষের থেকে শ্রেষ্ঠ। আবার কিছু দিকে পুরুষরা নারীদের থেকে শ্রেষ্ঠ। পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্বের একটি দিক হলো নেতৃত্ব দেয়ার দিক। অর্থাৎ নেতৃত্ব দেয়ার জন্যে যে সব দৈহিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা দরকার তা সৃষ্টিগতভাবে নারীদের চেয়ে পুরুষদের বেশি দেয়া হয়েছে। বিষয়টি চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতেও সত্য। মানুষ যদি এই সৃষ্টি রহস্যভিত্তিক কথা না মানে, তবে ভোগান্তি হবে তাদের, আল্লাহর নয়।

সমাজ পরিচালনা পদ্ধতির মূল বিষয়গুলো সম্পর্কে হাদীস

মুসলিম সমাজ পরিচালনার পদ্ধতির মূল বিষয়গুলো সম্পর্কিত কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন দিকগুলো রাসূল (সা.) কথা ও কাজের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে জানিয়ে দিয়েছেন। আর এটি তিনি করেছেন জামায়াতে সালাতের ইমাম সম্পর্কিত বিভিন্ন দিক কথা (কাওলী হাদীস) ও কাজ (ফে'য়লী হাদীস) দ্বারা জানিয়ে দেয়ার মাধ্যমে। চলুন এখন রাসূল (সা.)-এর সেই কাওলী ও ফে'য়লী হাদীসগুলো জানা যাক-

১. সালাতের ইমাম নির্ধারণ ও ইমামের যোগ্যতা বর্ণনাকারী কাওলী ও ফে'য়লী হাদীস

কাওলী হাদীস-১

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلاَ يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ. رواه مسلم و في رواية لَّهُ وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلَ فِيْ اَهْلِهِ.

অর্থ: আবু মাসউদ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- মানুষের ইমামতি করবে সে-ই যে কুরআন ভাল পড়ে। যদি কুরআন পড়ায় সকলে সমান হয় তবে যে সুন্নাহ বেশি জানে। যদি সুন্নাহেও সকলে সমান হয়, তবে যে হিজরত করেছে। যদি হিজরতেও সকলে সমান হয়, তবে যে বয়সে বেশি। কেউ যেন অপর ব্যক্তির অধিকার ও ক্ষমতাস্থলে ইমামতি না করে এবং তার বাড়িতে তার সম্মানের স্থলে না বসে অনুমতি ব্যতীত।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: সহীহ মুসলিম, হাদিস নং-১৫৬৪)

ব্যাখ্যা: কুরআন ভাল পড়ার অর্থ হচ্ছে শুদ্ধ করে পড়াসহ কুরআনের জ্ঞান থাকা। অর্থ না জেনে কুরআন মুখস্ত রাখাকে 'গাধার কাজ' বলে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন সূরা জুম'আর ৫নং আয়াতে। তাই, এ হাদীসটিতে রাসূল (সা.) ইমাম হওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় গুণাগুণ বা যোগ্যতাগুলো যে ক্রম অনুযায়ী উল্লেখ করেছেন তা হলো-

১. শুদ্ধ করে পড়াসহ কুরআনের জ্ঞান থাকা
২. সুন্নাহ তথা হাদীসের জ্ঞান থাকা
৩. হিজরত করা
৪. বেশি বয়স।

কাওলী হাদীস-২

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ. وَ ذَكَرَ حَدِيْثَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ فِيْ بَابِ بَعْدَ فَضْلِ الاَذَانِ.

অর্থ: আবু সায়ীদ খুদরী (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- যখন তিন ব্যক্তি হবে, তখন যেন তাদের মধ্য হতে একজন ইমামতি করে এবং ইমামতির অধিকার তার, যে কুরআন অধিক ভাল পড়ে ও জ্ঞান রাখে।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: সহীহ মুসলিম, হাদিস নং-১৫৬১)

ব্যাখ্যা: এ হাদীসখানির মাধ্যমে রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন-

- জামায়াতে সালাত আদায় করার সময় একাধিক মুক্তাদি হলে একজনকে ইমাম বানাতে হবে
- সালাতের ইমাম সেই হবে যে শুদ্ধ করে পড়াসহ কুরআনের জ্ঞান অধিক রাখে।

কাওলী হাদীস-৩

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ كُنَّا بِمَاءٍ مَمَرَّ النَّاسِ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ فَنَسْأَلُهُمْ مَا لِلنَّاسِ مَا هَذَا الرَّجُلُ فَيَقُوْلُوْنَ يَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ أَوْحَى إِلَيْهِ كَذَا فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذَلِكَ الْكَلاَمَ وَكَأَنَّمَا يُقَرُّ فِي صَدْرِي وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَلَوَّمُ بِإِسْلاَمِهِمُ الْفَتْحَ فَيَقُوْلُوْنَ اُتْرُكُوْهُ وَقَوْمَهُ فَإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِمْ فَهُوَ نَبِيٌّ صَادِقٌ فَلَمَّا كَانَتْ وَقْعَةُ أَهْلِ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلاَمِهِمْ وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلاَمِهِمْ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ جِئْتُكُمْ وَاللهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا فَقَالَ صَلُّوا صَلَوةَ كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا وَصَلُّوا صَلَوةَ كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَوةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ فَقَدَّمُوْنِي بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِيْنَ.

অর্থ: আমর ইবনে সালমা (রা.) বলেন, আমরা লোক চলাচলের পথে একটি কূপের নিকট বাস করতাম, যেখান দিয়ে আরোহীগণ চলাচল করত। আমরা তাদের জিজ্ঞাসা করতাম, মানুষের কী হল? তারা যে লোকটি সম্বন্ধে বলে তিনি কে? তারা উত্তর করত, লোকটি মনে করে তাকে আল্লাহ রাসূল করে পাঠিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি এইরূপ ওহী নাযিল করেছেন। তখন আমি ওহীর বাণীটি এমনভাবে মুখস্থ করে নিতাম যে তা আমার অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যেত। আরবগণ যখন ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে মক্কা বিজয়ের অপেক্ষা করছিল, তখন তারা বলত, তাঁকে (মুহাম্মাদকে) তাঁর গোত্রের সাথে বুঝতে দাও। যদি তিনি তাদের উপর জয়লাভ করেন তখন বুঝা

যাবে যে, তিনি সত্য নবী। যখন মক্কা বিজয়ের ঘটনা ঘটল তখন সকল গোত্রই ইসলাম গ্রহণে তাড়াহুড়ো করল এবং আমার পিতা গোত্রের অন্য সকলের আগে ইসলাম গ্রহণ করলেন। তিনি গোত্রে ফিরে এসে বললেন, আল্লাহর কসম আমি এক সত্য নবীর নিকট থেকে তোমাদের কাছে ফিরে এসেছি। তিনি বলে থাকেন, এই সালাত এই সময় পড়বে এবং ঐ সালাত ঐ সময় পড়বে। যখন সালাতের সময় উপস্থিত হবে, তখন তোমাদের মধ্য হতে কেউ যেন আযান দেয় এবং তোমাদের মধ্যে ইমামতি যেন সেই ব্যক্তি করে যে অধিক কুরআন জানে। তখন লোকেরা দেখল, আমার অপেক্ষা অধিক কুরআন জানে এমন কেউ নেই। কেননা আমি পথিকদের নিকট হতে পূর্বেই তা মুখস্থ করে নিয়েছিলাম। তখন তারা আমাকেই তাদের আগে বাড়িয়ে দিলো অথচ তখন আমি ছয় কি সাত বছরের বালকমাত্র ... ...

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: সহীহ বুখারী, হাদিস নং-৪০৫১)

ব্যাখ্যা: এ হাদীসটি থেকে বুঝা যায়, সালাতের ইমাম হওয়ার জন্যে কুরআনের জ্ঞান থাকা বয়সের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

কাওলী হাদীস-৪

عَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُوْنَ الْأَوَّلُوْنَ الْمَدِيْنَةَ كَانَ يَؤُمُّهُمْ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ وَ فِيْهِمْ عُمَرُ وَ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الأَسَدِ. رواه البخارى

অর্থ: ইবনে উমর (রা.) বলেন- রাসূল (সা.) এর হিজরতের পূর্বে যখন প্রথম মুহাজির দল মদীনা পৌঁছলেন, তখন আবু হুযায়ফার গোলাম সালেম (রা.) তাদের ইমামতি করতেন। অথচ তাদের মধ্যে তখন ওমর এবং আবু সালামা ইবনে আবদুল আসাদের ন্যায় লোকও বিদ্যমান ছিলেন।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: সহীহ বুখারী, হাদিস নং-৬৬০)

ব্যাখ্যা: হযরত সালেহ (রা.) একদিকে যেমন কুরআনের বড় জ্ঞানী ছিলেন, অপরদিকে তিনি বড় কারীও ছিলেন। রাসূল (সা.) যে চার ব্যক্তির নিকট থেকে কুরআন শিখতে বলেছিলেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। এ হাদীসটি থেকে বুঝা যায়- ইমাম হওয়ার যোগ্যতার মধ্যে শুদ্ধ করে পড়াসহ কুরআনের জ্ঞান থাকার গুরুত্ব বংশ, গোত্র অথবা মনিব, গোলাম ইত্যাদির চেয়ে ওপরে।

কাওলী হাদীস-৫

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُوْمٍ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى.

অর্থ: আনাস (রা.) বলেন- রাসূলুল্লাহ (সা.) ইবনে উম্মে মাকতুমকে সালাতে লোকের ইমামতি করার জন্যে আপন প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছিলেন অথচ তিনি ছিলেন অন্ধ।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: আস-সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং-৫৯৫। আলবানী বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ)

ব্যাখ্যা: হাদীসটি থেকে বুঝা যায়- সালাতের ইমাম হওয়ার যোগ্যতার মধ্যে শারীরিক পূর্ণতা বা সৌন্দর্যের গুরুত্ব অন্য যোগ্যতার গুরুত্বের চেয়ে কম। তাই সে সৌন্দর্য বা পূর্ণতা শরীরের রং, গঠন, পরিপূর্ণতা অথবা পোশাক-পরিচ্ছদের মূল্য বা কাটিং ইত্যাদি যে কিছুর জন্যেই হোক না কেন।

♦♦ উল্লিখিত ৫খানি হাদীস থেকে নিশ্চয়তা সহকারে জানা যায়- সালাতের ইমাম হওয়ার যোগ্যতা বা গুণাগুণগুলোর প্রথম চারটিকে গুরুত্বের ক্রম অনুযায়ী রাসূল (সা.) যেভাবে বলেছেন, তা হলো-

১. শুদ্ধ করে কুরআন পড়াসহ কুরআনের জ্ঞান থাকা
২. হাদীসের জ্ঞান থাকা
৩. হিজরত করা
৪. বয়স।

হাদীসগুলো অনুযায়ী, ইমাম হওয়ার যোগ্যতার ব্যাপারে শরীরের রং, গঠন, পূর্ণতা, বংশ, গোত্র, দেশ, পোশাক-পরিচ্ছদের মূল্য, কাটিং ইত্যাদির তেমন কোন গুরুত্ব নেই। তবে যেটি হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম তেমনটি হলে অর্থাৎ একাধিক ব্যক্তি উপরের চারটি যোগ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে একেবারেই সমান হলে ঐ বিষয়গুলো বিবেচনায় আসতে পারে।

ফে'য়লী হাদীস

রসূল (সা.) যতোদিন জীবিত ও সুস্থ্য ছিলেন ততোদিন সালাতের ইমামতি তিনিই করেছেন। আর এর কারণ ছিল- তিনিই ছিলেন কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান ও সে অনুযায়ী আমলের দিক থেকে অন্য সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

♣♣ কুরআন এবং কাওলী ও ফে'য়লী হাদীসের আলোকে ইমামের যোগ্যতার ব্যাপারে গুরুত্বের দৃষ্টিকোন থেকে প্রথম তিনটি বিষয় হলো-

ক. শুদ্ধ করে কুরআন পড়াসহ কুরআনের জ্ঞান থাকা
খ. হাদীসের জ্ঞান থাকা
গ. হিজরত করা

এ তিনটি বিষয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন ব্যক্তিকে যথাযথভাবে যাচাই করতে হলে ঐ তিনটি বিষয় সম্বন্ধে নিম্নের তথ্যগুলো জানা বিশেষভাবে দরকার-

ক. শুদ্ধ করে পড়াসহ কুরআনের জ্ঞান থাকা

যে কোন ভাষা শিক্ষার প্রথম স্তর হচ্ছে ঐ ভাষা শুদ্ধ করে পড়তে শেখা। পড়া শুদ্ধ না হলে অর্থ পাল্টে যায়। তাই ইমামের কুরআন তেলাওয়াত শুদ্ধ হওয়া দরকার। কিন্তু কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর স্পষ্ট বক্তব্য অনুযায়ী যা পড়া হচ্ছে সেটির জ্ঞান অর্জিত না হলে শুদ্ধ করে পড়ার কোন মূল্য নেই।

কোন ব্যাপক বিষয়ের (Vast Subject) সকল দিকের বিস্তারিত জ্ঞান থাকা সাধারণভাবে সম্ভব নয়। তাই স্বত:সিদ্ধভাবে কোন ব্যাপক বিষয়ে জ্ঞানী লোকদের নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা হয়-

- **সাধারণ জ্ঞানী**
  যার ঐ ব্যাপক বিষয়ের সকল বিভাগের (all discipline) মৌলিক জ্ঞান আছে
- **বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী**
  যার ঐ ব্যাপক বিষয়ের সকল বিভাগের মৌলিক জ্ঞান আছে এবং এক বা একাধিক বিভাগের বিস্তারিত জ্ঞান আছে। এ স্তরে অবস্থানকারীদের মধ্যে তাকেই বেশি জ্ঞানী বলা হবে যার বেশি দিকের বিস্তারিত জ্ঞান আছে
- **জ্ঞানী নয়**
  যার ঐ ব্যাপক বিষয়ের কোন এক দিকের মৌলিক জ্ঞানের অভাব আছে।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো পরিস্কার হবে- ধরুন চিকিৎসা বিদ্যা। এখানে এনাটমি, ফিজিওলজি, প্যাথলজি, মেডিসিন, সার্জারি, গাইনি, চক্ষু, নাক-কান-গলা, অর্থোপেডিক্স ইত্যাদি অনেক বিভাগ (Discipline) আছে। একজন চিকিৎসকের পক্ষে চিকিৎসা বিদ্যার সকল বিভাগে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই জ্ঞানের পরিব্যাপ্তির দৃষ্টিকোণ থেকে চিকিৎসকদের নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা হয়েছে-

- **সাধারণ জ্ঞানী বা অবিশেষজ্ঞ চিকিৎসক (Non-specialist doctor)**
  এ চিকিৎসকগণ হলেন তারা যাদের চিকিৎসা বিদ্যার সকল বিভাগের মৌলিক জ্ঞান আছে।
- **বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী বা বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক (Specialist doctor)**
  এ চিকিৎসকগণ হলেন তারা যাদের চিকিৎসা বিদ্যার সকল বিভাগের মৌলিক জ্ঞান আছে এবং একটি বিভাগের বিস্তারিত জ্ঞান আছে।
- **জ্ঞানী নয় বা চিকিৎসক নয়**
  এ হলো সে ব্যক্তি যার চিকিৎসা বিদ্যার এক বা একাধিক বিভাগের মৌলিক জ্ঞানের অভাব আছে।

এবার চলুন, কোন বিষয়ে জ্ঞানী হওয়া বা না হওয়ার এই চিরসত্য (Eternal Truth) তথ্যের আলোকে কুরআনের জ্ঞানী হওয়ার বিষয়টি পর্যালোচনা করা যাক-

পবিত্র কুরআন হচ্ছে মানুষের দুনিয়ার জীবন সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীলভাবে পরিচালনার মাধ্যমে পরকালে পুরস্কৃত হওয়ার লক্ষ্যে আল্লাহ প্রদত্ত গাইডবুক বা হেদায়েত। তাই দুনিয়ায় মানুষের জীবন নির্ভুলভাবে পরিচালনার জন্যে যতো বিষয় প্রয়োজন, তার সকল বিষয় সম্পর্কে কুরআনে বক্তব্য আছে। সেই বিষয়গুলোর মধ্যে প্রধান কয়েকটি হলো-

১. তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ), রেসালাত (নবী-রাসূল), আখিরাত, ফেরেশতা, কিতাব ইত্যাদি
২. সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি উপাসনা মূলক ইবাদত
৩. সমাজের একজনের সঙ্গে আর একজনের আচার-ব্যবহার, দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্থাৎ সমাজবিজ্ঞান (Social Science)
৪. বিবাহ, তালাক
৫. উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সম্পদের বণ্টন
৬. বিচারব্যবস্থা ও ফৌজদারী দণ্ডবিধি। বিচারক ও সাক্ষীর দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি
৭ শিক্ষাব্যবস্থা
৮. অর্থনীতি
৯. ব্যবসা-বাণিজ্য
১০. বিজ্ঞান
১১. যুদ্ধবিদ্যা, যুদ্ধাস্ত্র, যুদ্ধনীতি ইত্যাদি
১২. আন্তর্জাতিক নিয়ম-নীতি, সন্ধি (চুক্তি) ইত্যাদি
১৩. রাষ্ট্রবিজ্ঞান (Political Science)

তাহলে পূর্বোল্লিখিত কোন বিষয়ের জ্ঞানী হওয়ার চিরসত্য নিয়ম অনুযায়ী কুরআনের জ্ঞান থাকার বিভিন্ন পর্যায় (Grade) হবে নিম্নরূপ-

- **সাধারণ জ্ঞানী**
  যার কুরআনে উল্লিখিত সকল বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান আছে
- **বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী**
  যার কুরআনে উল্লিখিত সকল বিষয়ের মৌলিক জ্ঞান আছে এবং এক বা একাধিক বিষয়ে বিস্তারিত জ্ঞান আছে। এ স্তরে যার কুরআনে উল্লেখ থাকা বেশি সংখ্যক বিষয়ের বিস্তারিত জ্ঞান থাকবে, সে অধিক জ্ঞানী বলে বিবেচিত হবে
- **জ্ঞানী নয়**
  যার কুরআনে উল্লিখিত কোন এক বিষয়ে মৌলিক জ্ঞানের অভাব আছে।

কুরআনের জ্ঞানের বিষয়ে অন্য যে তথ্যটি সকলের মনে রাখা দরকার তা হলো- ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক (মূল মৌলিক) বিষয় কুরআনে উল্লেখ আছে। অন্যদিকে একটি প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় উল্লেখ থাকা সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করলে বিষয়টি সম্পর্কে শতভাগ নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে '**আমলের গুরুত্ব ভিত্তিক অবস্থান জানার সঠিক ও সহজ উপায়**' নামক বইটিতে।

খ. হাদীসের জ্ঞান থাকা

কুরআনের সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা হাদীসে আছে, তাই হাদীস পড়লেই তো ইসলামের সকল বিষয় ব্যাখ্যা সহকারে জানা যায়। কিন্তু রাসূল (সা.) সালাতের ইমামতি করার ব্যাপারে কুরআনের জ্ঞান থাকাকে হাদীসের জ্ঞান থাকার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলেছেন। তিনি কি বিনা কারণে এটি বলেছেন? অবশ্যই না। রাসূল (সা.) এটি করেছেন নিম্নোক্ত কারণে-

১. মৌলিক-অমৌলিক আমলের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারা

কুরআন-সুন্নাহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ইসলামের বিষয়গুলো প্রধানত: মৌলিক ও অমৌলিক-এ দু'ভাগে বিভক্ত। মৌলিক বিষয়গুলো আবার প্রথম স্তর ও দ্বিতীয় স্তর-এ দু'ভাগে বিভক্ত।

প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়গুলো হচ্ছে সেগুলো, যেগুলোর একটিও ইচ্ছাকৃতভাবে বা ছোটখাট ওজরের কারণে পালন না করলে একজন মানুষকে সরাসরি (Directly) জাহান্নামে যেতে হবে।

দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয়গুলো হচ্ছে প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়গুলোর বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়। এগুলোর একটি ইচ্ছাকৃতভাবে বা ছোট ওজরের কারণে পালন না করলেও একজন মুসলমানকে জাহান্নামে যেতে হবে, তবে এ জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে পরোক্ষ (Indirect)। কারণ দ্বিতীয় স্তরের একটি মৌলিক বিষয় পালন না করলে ঐ বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত প্রথম স্তরের মৌলিক কাজটি ব্যর্থ হবে। তাই ব্যক্তিকে জাহান্নামে যেতে হবে।

আর অমৌলিক আমলগুলোর সবক'টিও যদি কেউ, ঘৃণা বা অস্বীকার না করে পালন করা থেকে বিরত থাকে তবে তাকে জাহান্নামে যেতে হবে না। এ জন্য শুধু তার বেহেশতের মান (Grade) কিছুটা কমবে।

সূরা নাহলের ৮৯ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, আল কুরআনে তিনি ইসলামের সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয়ের সবগুলো কুরআনে উল্লেখ নেই। সেগুলো আছে শুধু সুন্নাহ তথা হাদীসে। আর অমৌলিক আমলের প্রায় সবই আছে শুধু হাদীসে। কিন্তু শুধু হাদীস পড়ে কোন্ আমলগুলো মৌলিক আর কোন্গুলো অমৌলিক এটি বুঝা অসম্ভব।

তাই, যদি শুধু হাদীস পড়েই ইসলামকে জানার ব্যবস্থা চালু হয়, তবে মুসলমানরা ইসলামের কোন্ বিষয়গুলো মৌলিক আর কোন্ বিষয়গুলো অমৌলিক, তা বুঝতে পারবে না। ফলে ইসলাম পালনের সময় তারা অমৌলিক বিষয়গুলো মৌলিক বিষয়গুলোর থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে পালন করতে থাকবে, যা তারা বর্তমানে করছে। যে কোন জীবনব্যবস্থা ব্যর্থ হওয়ার জন্যে এটি একটি অত্যন্ত বড় কারণ। ইসলামের মৌলিক ও অমৌলিক বিষয়ের মহা ক্ষতিকর এই মিশ্রণ এড়ানোর জন্যে রাসূল (সা.) মক্কী জীবনে, হাদীস লিপিবদ্ধ করাকে নিষেধ করেছেন কিন্তু কুরআন নাযিলের সাথে সাথে তিনি তা লিপিবদ্ধ ও মুখস্থ করার ব্যবস্থা করেছেন।

ইমাম হওয়ার যোগ্যতার বিষয়ে রাসূল (সা.)-এর কুরআনের জ্ঞান থাকাকে হাদীসের জ্ঞান থাকার আগে উল্লেখ করার এটি অন্যতম প্রধান কারণ।

২. মিথ্যা হাদীস শনাক্ত করতে পারা

ইসলামের শত্রুরা বা ইসলামের অতি ভক্তরা, রাসূল (সা.) যে কথা বলেননি বা যে কাজ করেননি, তেমন বিষয়কেও হাদীস বলে চালিয়ে দিয়েছে, দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও দিবে। কারণ, হাদীস বানানো বা পরিবর্তন করা সম্ভব। এরকম অসংখ্য হাদীস বানানো বা পরিবর্তন করা হয়েছে বলেই ইমাম বুখারী (রহ.) ৬ (ছয়) লক্ষ হাদীস বাছাই করে দ্বিরুক্তি বাদ দিয়ে মাত্র ২৬০২-২৭৬১টি হাদীসকে বুখারী শরীফে উল্লেখ করার মত যোগ্যতাসম্পন্ন পেয়েছেন।

অন্যদিকে হাদীসের গ্রন্থসমূহে মিথ্যা হাদীস শনাক্ত করার উপায় হিসাবে হাদীস বর্ণনাকারীদের (রাবী) চরিত্র, মেধা, স্মরণশক্তি, ইসলাম পালন, পরিচিতি, বর্ণনাকারীর সংখ্যা ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করা হয়েছে। যে সব হাদীসের বর্ণনাকারী (রাবী) উপরোক্ত গুণাগুণের বিচারে উত্তীর্ণ হয়েছেন তাঁদের বর্ণনাকৃত হাদীসকে **'সহীহ হাদীস'** হিসেবে ধরা হয়েছে। কারণ, এটি ধরে নেয়া হয়েছে যে, উপরোক্ত গুণাবলী যে ব্যক্তির মধ্যে আছে, তিনি মিথ্যা হাদীস বা বানানো হাদীস বলতে পারেন না। অর্থাৎ প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে হাদীসকে 'সহীহ' বলা হয়েছে- সনদের (বর্ণনা সূত্র) নির্ভুলতার ভিত্তিতে। মতনের (বক্তব্য বিষয়) নির্ভুলতার ভিত্তিতে নয়। তাই প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে থাকা সকল সহীহ হাদীস নির্ভুল একথা নিশ্চয়তা দিয়ে বলা যায় না।

কিন্তু যদি দেখা যায়, কোন হাদীসের বক্তব্য কুরআনের কোন স্পষ্ট বক্তব্যের বিরোধী, তবে নির্দ্বিধায় বলতে হবে, সে হাদীসটি বানানো বা জাল হাদীস। কারণ, কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিরোধী কোন কথা, কাজ বা সমর্থন রাসূল (সা.) অবশ্যই করতে পারেন না। একথা কুরআন পরিস্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছে সূরা হাক্কার ৪৪-৪৭ নং আয়াতসমূহের মাধ্যমে। এ বিষয়টি সকল মুসলমানের নিকট অত্যন্ত পরিস্কার থাকা দরকার। হাদীস সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?'** নামক বইটিতে।

ইমাম হওয়ার যোগ্যতার বিষয়ে রাসূল (সা.)-এর কুরআনের জ্ঞান থাকাকে হাদীসের জ্ঞান থাকার আগে উল্লেখ করার এটিও একটি প্রধান কারণ।

গ. হিজরত করা

সালাতের ইমাম হওয়ার গুণাবলীর মধ্যে রাসূল (সা.) তিন নম্বরে উল্লেখ করেছেন হিজরত করাকে। হিজরত ইসলামের একটি আমল বা কাজ। কিন্তু বর্তমানে এটি সাধারণভাবে চালু নাই। তাই বর্তমান বিশ্ব মুসলমানদের এটি ভাল করে বুঝতে হবে যে, সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, যিকির-আযকারসহ ইসলামের অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ আমল থাকা সত্ত্বেও রাসূল (সা.) কেন ইমাম হওয়ার তিন নম্বর গুণ হিসেবে এমন একটি আমলের নাম উল্লেখ করেছেন যা সাধারণভাবে চালু নেই। বিষয়টি বুঝতে হলে হিজরত সম্বন্ধে নিম্নের তথ্যগুলো সামনে রাখতে হবে-

হিজরতের অর্থ

হিজরত ইসলামের একটি পরিভাষা। এর অর্থ হচ্ছে, একটি বিশেষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নিজ জন্মভূমি, আত্মীয়-স্বজন, সহায়-সম্পত্তি ছেড়ে স্থায়ীভাবে অন্য স্থানে চলে যাওয়া।

হিজরতের উদ্দেশ্য

রাসূল (সা.)কে দুনিয়ায় পাঠানোর উদ্দেশ্য হলো- আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করে দুনিয়ার মানুষকে দেখিয়ে দেয়া। আর মহান আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো- আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করে মানুষের কল্যাণ করা। এ কাজটি শুধুমাত্র করা সম্ভব ইসলামকে বিজয়ী তথা শাসন ক্ষমতায় বসানোর মাধ্যমে।

নবুয়াত প্রাপ্তির পর রাসূল (সা.) মক্কায় ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে কার্যক্রম চালাতে থাকেন। কিন্তু ১৩ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করার পর তিনি বুঝতে পারলেন মক্কায় ইসলামকে বিজয়ী করা সম্ভব নয়। কারণ সেখানকার অধিকাংশ মানুষ ছিল ইসলামের সক্রিয় বিরোধী। পক্ষান্তরে মদিনার অবস্থা ছিল ভিন্ন। সেখানকার অধিকাংশ মানুষ হয় ইসলামের পক্ষে, না হয় নিষ্ক্রিয় বিরোধী ছিল। অর্থাৎ আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইন অনুযায়ী মক্কায় ইসলাম বিজয়ী হওয়া সম্ভব ছিল না কিন্তু মদিনায় তা ছিল। তাই তিনি নিজের প্রাণপ্রিয় জন্মভূমি, আত্মীয়-স্বজন ও সহায়-সম্পত্তি ছেড়ে আল্লাহর নির্দেশে মদিনায় হিজরত করার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং হিজরত করলেন। মদিনায় পৌঁছে প্রথমেই তিনি ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে ঘোষণা করে একটি ছোট ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করলেন।

হিজরত সম্বন্ধে উপরোক্ত তথ্য পর্যালোচনার পর এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে- হিজরত ইসলামের এমন একটি আমল বা কাজ যার উদ্দেশ্য ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং যেটি করতে দেশ, আত্মীয়-স্বজন ও সহায়-সম্পদ ছেড়ে যাওয়ার মত অত্যন্ত কঠিন ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।

আশা করি এখন সবার নিকট পরিস্কার হবে যে- সালাতের ইমাম হওয়ার জন্যে রাসূল (সা.) হিজরত নামক আমল দ্বারা ঐ সব কাজকে বুঝাতে চেয়েছেন, যার উদ্দেশ্য হবে ইসলামকে বিজয়ীশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং যা করতে যেয়ে কঠিন ত্যাগ স্বীকার করতে হয়।

তাই সহজে বুঝা যায়- ইমাম হওয়ার গুণাগুণের মধ্যে হিজরত করাকে তিন নম্বরে উল্লেখ করার মাধ্যমে রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন- ইমাম হওয়ার তিন নম্বর গুণ হবে এক ও দুই নম্বর গুণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা। আর আমলগুলোর গুরুত্বের ক্রম অনুযায়ী অবস্থান হবে-

১. ঐ সকল মৌলিক কাজ যার উদ্দেশ্য হবে দ্বীনকে বিজয়ী করা এবং যা করতে মাল ও জানের প্রচণ্ড ত্যাগ স্বীকার করা লাগে
২. ঐ সকল মৌলিক কাজ যা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিভাগের মধ্যে পড়ে
৩. ঐ সকল মৌলিক কাজ যা মানুষ সৃষ্টির পাথেয় বিভাগের মধ্যে পড়ে
৪. ইসলামের অমৌলিক কাজ।

♦♦ তাহলে সালাতের ইমাম হওয়ার জন্যে যে গুণাবলীর প্রয়োজন হবে বলে আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন এবং রাসূল (সা.) তাঁর কাওলী এ ফে'য়লী হাদীসের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন, গুরুত্বের ক্রম অনুযায়ী সেগুলো হলো-

১. শুদ্ধ করে কুরআন পড়াসহ কুরআনের জ্ঞান থাকা। এখানে কুরআনের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীকে সাধারণ জ্ঞানীর চেয়ে বেশি যোগ্য ধরতে হবে এবং বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের মধ্যে যার কুরআনের বেশি সংখ্যক বিভাগের বিশেষ জ্ঞান আছে, তাকে বেশি যোগ্য ধরতে হবে
২. হাদীসের জ্ঞান থাকা
৩. আমল করা। আর আমল করার ব্যাপারে নিম্নের ক্রম অনুযায়ী যার আমল যতো বেশি হবে তাকে ততো বেশি যোগ্য ধরতে হবে-
    ক. ঐ সকল মৌলিক আমল যার উদ্দেশ্য ইসলামকে বিজয়ী করা তথা শাসন ক্ষমতায় বসান এবং যা পালন করতে প্রচণ্ড ত্যাগ স্বীকার করা লাগে
    খ. ঐ সকল মৌলিক আমল যা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিভাগের মধ্যে পড়ে
    গ. ঐ সকল মৌলিক আমল যা মানুষ সৃষ্টির পাথেয় বিভাগের মধ্যে পড়ে
    ঘ. অমৌলিক আমল।
৪. বয়স
৫. শারীরিক পরিপূর্ণতা, গায়ের রং, বংশ, গোত্র, দেশ, মনিব, গোলাম, পোশাক-পরিচ্ছদের মূল্য ও তৈরির ধরন ইত্যাদি, সালাতের ইমামের যোগ্যতা যাচাইয়ের মানদণ্ডে তখনই শুধু আসতে পারে যখন উপরের সকল

গুণ একাধিক ব্যক্তির মধ্যে একই মানের হবে। এটি প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার।

২. সালাতের ইমাম নির্ণয় করার পদ্ধতি বর্ণনাকারী কাওলী ও ফে'য়লী হাদীস

কাওলী হাদীস-১

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةٌ لاَ يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُمْ صَلَوتُهُمْ مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلَوةَ دِبَارًا وَالدِّبَارُ أَنْ يَأْتِيَهَا بَعْدَ أَنْ تَفُوتَهُ وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرَهُ.

অর্থ: ইবনে উমর (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন- তিন ব্যক্তির সালাত কবুল হবে না- যে কোন গোত্র (বা জাতির) ইমাম (সমাজের নেতা বা সালাতের ইমাম) হয়েছে অথচ তারা তাকে পছন্দ করে না, যে সালাত পড়তে আসে দিবারে; দিবার বলে সালাতের উত্তম সময়ের পরের সময়কে এবং যে কোন স্বাধীন নারীকে দাসীতে পরিণত করে।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: আস-সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং- ৫৯৩)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানির বক্তব্য হলো- যে ব্যক্তি কোন গোত্র বা জাতির সমাজের নেতা বা সালাতের ইমাম হয়েছে অথচ লোকেরা (জনগণ বা মুক্তাদিগণ) তাকে পছন্দ করে না তার সালাত কবুল হবে না। আর পছন্দ করা বা না করার মানদন্ড হবে কুরআন ও হাদীসের পূর্বে উল্লেখিত যোগ্যতা বা গুণগুলো।

তাই হাদীসখানি থেকে জানা যায়- মুসলিম সমাজের নেতা বা সালাতের ইমাম হবেন তিনি যাকে সকল বা অধিকাংশ মুসলিম বা সালাত আদায়কারী পূর্বে উল্লেখিত মানদণ্ডের আলোকে বিবেচনা করে অধিক যোগ্য বলে সম্মতি বা ভোট দিবেন।

কাওলী হাদীস-২

وَ عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَةٌ لاَ تُجَاوِزُ صَلَوتُهُمْ آذَانَهُمُ الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ. رواه الترمذى وَقَالَ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

অর্থ: আবু উমামা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন- তিন ব্যক্তির সালাত তাদের কানের সীমা অতিক্রম করে না (অর্থাৎ কবুল হয় না)- পালাতক দাস যতোক্ষণ সে ফিরে না আসে। যে নারী রাত্রি যাপন করেছে অথচ তার স্বামী তার ওপর অসন্তুষ্ট।

আর গোত্র (বা জাতির) ইমাম (সমাজের নেতা বা সালাতের ইমাম) অথচ মানুষ তাকে পছন্দ করে না।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: আস-সুনান তিরমিযি, হাদিস নং-৩৬০; হাদীসটিকে তিরমিযী গরীব বলেছেন)

ব্যাখ্যা: এ হাদীসখানির ব্যাখ্যা থেকেও মুসলিম সমাজের নেতা বা সালাতের ইমামের বিষয়ে ১নং তথ্যের হাদীসখানির ন্যায় তথ্য বের হয়ে আসবে।

কাওলী হাদীস-৩

وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَ تَرْتَفِعُ صَلَوتُهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ. وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ.

অর্থ: ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, তিন ব্যক্তির সালাত তাদের মাথার উপর এক বিঘতও ওঠে না তথা কবুল হয় না- যে ব্যক্তি কোন গোত্র বা জাতির ইমাম হয় কিন্তু তারা (সঙ্গত কারণে) তাকে পছন্দ করে না, সেই নারী যে রাত্রি যাপন করেছে অথচ তার স্বামী তার ওপর নাখোশ এবং সেই দুই ভাই যারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন।

(আল মাকতাবাতুশ শামেলাহ: আস-সুনান ইবনে মাজাহ, হাদিস নং-৯৭১)

ব্যাখ্যা: এ হাদীসখানির ব্যাখ্যা থেকেও মুসলিম সমাজের নেতা বা সালাতের ইমামের বিষয়ে ১নং তথ্যের হাদীসখানির ন্যায় তথ্য বের হয়ে আসবে।

ফে'য়লী হাদীস

রাসূল (সা.) যতোদিন জীবিত ও সুস্থ্য ছিলেন ততোদিন তিনি মুসলিম সমাজের নেতৃত্ব এবং সালাতের ইমামতি করেছেন। এটিতে কোন প্রকৃত মুসলিম দ্বিমত পোষন করেন নি। কারণ, পূর্বে উল্লেখিত মানদন্ডের আলোকে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে যোগ্য।

♦♦ তাহলে সমাজের নেতা বা সালাতের ইমাম নির্ণয় করার পদ্ধতি সম্বন্ধে আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন এবং রাসূল (সা.) তাঁর কাওলী এ ফে'য়লী হাদীসের মাধ্যমে যা জানিয়ে দিয়েছেন তা হলো- যাকে সকল বা অধিকাংশ মুসলিম বা সালাত আদায়কারী পূর্বে উল্লেখিত মানদন্ডের আলোকে বিবেচনা করে অধিক যোগ্য বলে সম্মতি বা ভোট দিবেন তিনিই হবেন মুসলিম সমাজের নেতা বা সালাতের ইমাম।

৩. কাওলী এ ফে'য়লী হাদীসের আলোকে ইমামের সালাত পরিচালনা পদ্ধতি

রাসূল (সা.)-এর কাওলী এ ফে'য়লী হাদীসের আলোকে ইমামের সালাত পরিচালনার যে পদ্ধতি নির্ণিত হয়েছে এবং চালু আছে তা হলো-

- ইমামকে কুরআন-হাদীসে বর্ণিত গণ্ডির মধ্যে থেকে সালাত পরিচালনা করতে হবে
- সালাত পরিচালনার সময় ইমামকে মুক্তাদিদের সুবিধা-অসুবিধার দিকে খেয়াল রাখতে হবে। যেমন- জামায়াতে সালাতে ইমামের লম্বা সূরা পড়া ঠিক নয়। কারণ, মুক্তাদিদের মধ্যে কেউ অসুস্থ্য বা ব্যস্ত থাকতে পারে।

৪. কাওলী এ ফে'য়লী হাদীসের আলোকে সালাতের ইমামের আনুগত্য ও অপসারণ পদ্ধতি

রাসূল (সা.)-এর কাওলী এ ফে'য়লী হাদীসের আলোকে সালাতের ইমামের যে আনুগত্য ও অপসারণ পদ্ধতি নির্ণিত হয়েছে এবং চালু আছে তা হলো-

- ইমাম যতোক্ষণ সঠিকভাবে অর্থাৎ কুরআন-সুন্নাহে উল্লিখিত নীতিমালা অনুযায়ী সালাত পরিচালনা করবেন ততোক্ষণ তাঁকে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে
- ইমাম ভুল করলে ভয় না করে পিছন থেকে লোকমার মাধ্যমে অর্থাৎ গঠনমূলকভাবে তাঁকে শোধরানোর জন্যে বলতে হবে
- ইমাম শুধরিয়ে নিলে তাঁর আনুগত্য বহাল রাখতে হবে
- লোকমার পরও ইমাম যদি কোন মারাত্মক ভুল শুধরিয়ে না নেন, তবে তাঁকে বাদ দিয়ে সকল বা অধিকাংশ মুক্তাদির মতামতের মাধ্যমে নতুন ইমাম নির্বাচন করতে হবে।

৫. কাওলী এ ফে'য়লী হাদীসের আলোকে সালাতের ইমাম মহিলা বা পুরুষ হওয়া

রাসূল (সা.)-এর কাওলী এ ফে'য়লী হাদীসের আলোকে সালাতের ইমাম মহিলা বা পুরুষ হওয়ার বিষয়টি সম্পর্কে যা নির্ণিত হয়েছে এবং চালু আছে তা হলো- সালাতের জামায়াত যদি শুধু পুরুষের হয় বা পুরুষ ও মহিলা মিশ্রিত হয় তাহলে ইমাম হবে পুরুষ। কিন্তু জামায়াত যদি শুধু মহিলাদের হয় তবে সেখানে মহিলা ইমাম হতে পারবে।

সালাত থেকে সমাজ পরিচালনা পদ্ধতির মূল বিষয়গুলো যে উপায়ে শেখানো হয়েছে

সালাত থেকে সমাজ পরিচালনা পদ্ধতির মূল বিষয়গুলো তাত্ত্বিকভাবে (Theoretically) শেখানো হয়েছে সালাতের পঠিত বিষয় কুরআন থেকে। আর ব্যবহারিকভাবে (Practically) বিষয়গুলো শেখানো হয়েছে জামায়াতে সালাতের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এখন আমরা সমাজ পরিচালনা পদ্ধতির মূল বিষয়গুলো (নেতা নির্ধারণ করা, নেতা হওয়ার যোগ্যতা, নেতা নির্ণয় করার পদ্ধতি, নেতার সমাজ বা দেশ পরিচালনা পদ্ধতি, নেতার আনুগত্য পদ্ধতি, নেতার অপসারণ পদ্ধতি, মহিলা নেতা না পুরুষ নেতা) সালাত থেকে কিভাবে শেখানো হয়েছে তা আলোচনা করবো।

১. সমাজের নেতা নির্ধারণ করার বিষয়টি তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকভাবে সালাত থেকে যেভাবে শেখানো হয়েছে

তাত্ত্বিক উপায়

সালাত আদায়কারীগণ যদি পূর্বে উল্লিখিত সমাজের নেতা নির্ধারণ করার বিষয়টি ধারণকারী কুরআনের আয়াতক'খানি বা এ ধরনের বক্তব্য ধারনকারী যেকোন আয়াত সূরা ফাতিহার পর পড়ে তাহলে মুসলিম সমাজের নেতা নির্ধারণ করার বিষয়টি রিভিশন দেয়ার মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে তার স্মরণে থাকবে।

ব্যবহারিক উপায়

সমাজের নেতা নির্ধারণ করার বিষয়টি ব্যবহারিকভাবে সালাত থেকে শেখানো হয়েছে জামায়াতে সালাতের ইমাম নির্ধারণ করার বিষয়টির মাধ্যমে। কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিধান হলো- জামায়াতে সালাত আদায় করার সময় সালাত আদায়কারীর সংখ্যা একের আধিক হলে সালাত আদায়কারীদের মধ্য থেকে একজনকে ইমাম বানাতে হবে।

তাই জামায়াতে সালাতের অনুষ্ঠানের এ বিধান থেকে শিক্ষা হলো- মুসলিম সমাজে একের অধিক মানুষ হলে একজনকে নেতা বানাতে হবে। সবাই নেতা হওয়া চলবে না।

২. সমাজের নেতা হওয়ার যোগ্যতার বিষয়টি তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকভাবে সালাত থেকে যেভাবে শেখানো হয়েছে

তাত্ত্বিক উপায়

সালাত আদায়কারীগণ যদি পূর্বে উল্লিখিত সমাজের নেতা হওয়ার যোগ্যতার বিষয়টি ধারণকারী কুরআনের আয়াতক'খানি বা এ ধরনের বক্তব্য ধারনকারী যেকোন আয়াত সূরা ফাতিহার পর পড়ে তাহলে মুসলিম সমাজের নেতা হওয়ার যোগ্যতার বিষয়টি রিভিশন দেয়ার মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে তার স্মরণে থাকবে।

ব্যবহারিক উপায়

সমাজের নেতার যোগ্যতার বিষয়টি ব্যবহারিকভাবে সালাত থেকে শেখানো হয়েছে জামায়াতে সালাতের ইমাম হওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণ করে দেয়ার মাধ্যমে। কুরআন ও হাদীসের আলোকে গুরুত্বের দিক দিয়ে ইমামের যোগ্যতার প্রথম চারটি হলো-

- শুদ্ধ করে পড়াসহ কুরআনের জ্ঞান থাকা
- হাদীসের জ্ঞান থাকা
- হিজরাত করা তথা এমন আমল করা যা পালন করতে প্রচন্ড ত্যাগ স্বীকার করতে হয় এবং যার উদ্দেশ্য হবে ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসাবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা
- বেশি বয়স

তাই জামায়াতে সালাতের অনুষ্ঠানের এ বিষয় থেকে শিক্ষা হলো- মুসলিম সমাজের স্থানীয় থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যন্ত সকল স্তরের নেতা হওয়ার প্রয়োজনীয় যোগ্যতার প্রথম ৪টি হবে সালাতের ইমাম হওয়ার যোগ্যতার প্রথম ৪টির অনুরূপ।

৩. সমাজের নেতা নির্বাচন পদ্ধতির বিষয়টি তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকভাবে সালাত থেকে যেভাবে শেখানো হয়েছে

তাত্ত্বিক উপায়

সালাত আদায়কারীগণ যদি পূর্বে উল্লিখিত সমাজের নেতা নির্বাচন পদ্ধতি ধারণকারী কুরআনের আয়াতক'খানি বা এ ধরনের বক্তব্য ধারনকারী যেকোন আয়াত সূরা ফাতিহার পর পড়ে তাহলে মুসলিম সমাজের নেতা নির্বাচন পদ্ধতির বিষয়টি রিভিশন দেয়ার মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে তার স্মরণে থাকবে।

ব্যবহারিক উপায়

সমাজের নেতা নির্ণয়ের পদ্ধতির বিষয়টি ব্যবহারিকভাবে সালাত থেকে শেখানো হয়েছে জামায়াতে সালাতের ইমাম নির্বাচন পদ্ধতির মাধ্যমে। কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী বিধান হলো- মুক্তাদিদেরকে সকল বা অধিকাংশের সমর্থনের মাধ্যমে অধিক যোগ্য ব্যক্তিকে জামায়াতের ইমাম নির্বাচন করতে হবে। আর সে যোগ্যতার মাপকাঠি কি হবে তা ওপরে বর্ণিত হয়েছে।

তাই, জামায়াতে সালাতের অনুষ্ঠান থেকে এ বিষয়ের শিক্ষা হলো- মুসলিমদেরকে সকলের বা অধিকাংশের সমর্থনের মাধ্যমে যোগ্য ব্যক্তিকে তাদের সমাজের নেতা নির্বাচন করতে হবে। আর নেতা হওয়ার যোগ্যতা হবে সালাতের ইমাম হওয়ার যোগ্যতার অনুরূপ।

♣♣ বর্তমানে সালাত আদায়কারীগণ যাদেরকে তাদের সমাজের নেতা বানান তাদের প্রায় সবাই ঐ চারটি যোগ্যতা থেকে অনেক দূরে। তাই, এ দৃষ্টিকোন থেকে তারা সালাত পড়ছেন কিন্তু যথাযথভাবে কায়েম করছেন না। আর তাই এ দৃষ্টিকোন থেকে তাদের সালাত কবুল হওয়ার বিষয়ে বিরাট প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

৪. নেতার সমাজ বা দেশ পরিচালনা পদ্ধতির বিষয়টি তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকভাবে সালাত থেকে যেভাবে শেখানো হয়েছে

তাত্ত্বিক উপায়

সালাত আদায়কারীগণ যদি পূর্বে উল্লিখিত মুসলিম দেশের নেতার দেশ পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী কুরআনের আয়াতক'খানি বা এ ধরনের বক্তব্য ধারনকারী যেকোন আয়াত সূরা ফাতিহার পর পড়ে তাহলে সমাজের নেতার দেশ পরিচালনা পদ্ধতির বিষয়টি রিভিশন দেয়ার মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে তার স্মরণে থাকবে।

ব্যবহারিক উপায়

সমাজ বা দেশের নেতার দেশ পরিচালনা পদ্ধতির বিষয়টি ব্যবহারিকভাবে সালাত থেকে শেখানো হয়েছে জামায়াতে ইমামের সালাত পরিচালনা পদ্ধতির মাধ্যমে। সে পদ্ধতি হলো-

- ইমামকে সালাত পরিচালনা করতে হবে কুরআন ও সুন্নাহ বর্ণিত গণ্ডির মধ্যে থেকে
- সালাত পরিচালনার সময় ইমামকে মুক্তাদিদের সুবিধা-অসুবিধার দিকে খেয়াল রাখতে হবে

তাই, জামায়াতে সালাতের অনুষ্ঠান থেকে মুসলিম সমাজ বা দেশের নেতার সমাজ বা দেশ পরিচালনা পদ্ধতির শিক্ষা হলো-

- দেশ পরিচালনার ব্যাপারে নেতা স্বাধীন নয়। কুরআন ও সুন্নাহ বর্ণিত গণ্ডির মধ্যে থেকে তাকে দেশ চালাতে হবে
- দেশ পরিচালনার সময় সাধারণ নাগরিকের সুবিধা-অসুবিধা তথা কল্যাণের দিকে নেতাকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে।

♣♣ বর্তমানে মুসলিম নেতাগণ কুরআন ও সুন্নাহর জানিয়ে দেয়া নীতিমালার আলোকে তাদের দেশ চালাচ্ছেন কী? তাই, এ দৃষ্টিকোন থেকে ঐ নেতাগণ সালাত পড়ছেন কিন্তু কায়েম করছেন না। আর তাই এ দৃষ্টিকোন থেকে তাদের সালাত কবুল হওয়ার বিষয়ে বিরাট প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

৫. সমাজের নেতার আনুগত্য ও অপসারণ পদ্ধতির বিষয়টি তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকভাবে সালাত থেকে যেভাবে শেখানো হয়েছে

তাত্ত্বিক উপায়

সালাত আদায়কারীগণ যদি কুরআনে উল্লিখিত নেতার আনুগত্যের পদ্ধতি ধারণকারী কুরআনের যেকোন আয়াত সূরা ফাতিহার পর পড়ে তাহলে মুসলিম সমাজের নেতার দেশ পরিচালনার পদ্ধতির বিষয়টি রিভিশন দেয়ার মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে তার স্মরণে থাকবে।

ব্যবহারিক উপায়

মুসলিম সমাজের নেতার আনুগত্য ও অপসারণ পদ্ধতির বিষয়টি ব্যবহারিকভাবে শেখানো হয়েছে ইমামের আনুগত্য ও অপসারণ পদ্ধতির মাধ্যমে যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। ঐ পদ্ধতি অনুযায়ী মুসলিম সমাজ বা দেশের নেতার আনুগত্য ও অপসারণের পদ্ধতি হবে নিম্নরূপ-

- নেতা যতোক্ষণ কুরআন হাদীসে বর্ণিত সীমারেখার মধ্যে থেকে সমাজ পরিচালনা করবেন, ততোক্ষণ অবশ্যই তাঁর আনুগত্য করতে হবে
- নেতা ভুল করলে নির্ভয়ে, ভদ্র ও গঠনমূলকভাবে তাঁর ভুল ধরিয়ে দিতে হবে

- মারাত্মক ভুল ধরিয়ে দেয়ার পরও নেতা যদি শুধরিয়ে না নেন তবে তাঁকে অপসারণ করে ভোটের মাধ্যমে নতুন নেতা নির্বাচন করতে হবে।

♣♣ বর্তমান মুসলিম দেশে নেতার আনুগত্য ও অপসারণ এ পদ্ধতিতে হয় কী? তাই, এ দৃষ্টিকোন থেকে বর্তমান মুসলিম দেশের নাগরিকগণ সালাত পড়ছেন কিন্তু কায়েম করছেন না। আর তাই এ দৃষ্টিকোন থেকেও তাদের সালাত কবুল হওয়ার বিষয়ে বিরাট প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

৬. সমাজের নেতা পুরুষ বা মহিলা হওয়ার বিষয়টি তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকভাবে সালাত থেকে যেভাবে শেখানো হয়েছে

তাত্ত্বিক উপায়

সালাত আদায়কারীগণ যদি কুরআনে উল্লিখিত মুসলিম সমাজের নেতা পুরুষ বা মহিলা হওয়ার বিষয়টি ধারণকারী কুরআনের আয়াতখানি বা নারী ও পুরুষের শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধি-বৃত্তি সম্পর্কিত বক্তব্যধারণকারী যেকোন আয়াত সূরা ফাতিহার পর পড়ে তাহলে মুসলিম সমাজের নেতা পুরুষ বা মহিলা হওয়ার বিষয়টি রিভিশন দেয়ার মাধ্যমে তাত্ত্বিকভাবে তার স্মরণে থাকবে।

ব্যবহারিক উপায়

সমাজের নেতা পুরুষ বা মহিলা হওয়ার বিষয়টি ব্যবহারিকভাবে শেখানো হয়েছে সালাতে ইমামের পুরুষ বা মহিলা হওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার নীতিমালার মাধ্যমে যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

ঐ নীতিমালা অনুযায়ী মুসলিম সমাজ বা দেশের নেতার পুরুষ বা মহিলা হওয়ার নীতিমাল হবে এরূপ- কর্মক্ষেত্র যদি শুধু পুরুষ বা পুরুষ ও মহিলা মিশ্রিত হয় তাহলে পুরুষ নেতা হবে। কিন্তু কর্মক্ষেত্র শুধু মহিলাদের হয় তবে সেখানে মহিলা নেতা হতে পারবে।

সুধী পাঠক, এ পর্যন্ত এসে আপনারা নিশ্চয় স্বীকার করবেন সালাতের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেয়া ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের শিক্ষাগুলো যদি বর্তমান মুসলিম দেশগুলোতে যথাযথভাবে চালু থাকতো তবে মুসলিম দেশগুলো সুখ, সমৃদ্ধি ও প্রগতির শিখরে উঠে যেত।

সালাতের পঠিত বিষয় থেকে শিক্ষা

সালাতের কিছু নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্ট কুরআনের আয়াত, তাসবীহ ও দোয়া সকল সালাত আদায়কারীকে পড়তে হয়। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দু'টি-

১. কুরআন পড়ার মাধ্যমে সালাত আদায়কারীকে ইসলামের মূল বা প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়গুলো ভুলে না যাওয়ার ব্যবস্থা করা

২. তাসবীহ ও দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহর সামনে দাঁড় করিয়ে সালাত আদায়কারীর মুখ দিয়ে কিছু স্বীকৃতি বা অঙ্গীকার আদায় করে নেয়া, যাতে

সালাতের বাইরেও ঐ কথা বা অংগীকার অনুযায়ী তার জীবন পরিচালনা করে।

সালাতে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে তাসবীহ ও দোয়ার মাধ্যমে যে কথাগুলো নামাজী বলে বা স্বীকার করে বাস্তব জীবনে যদি ঐ অনুযায়ী সে না চলে, তবে সালাত আদায়কারীর কথা ও কাজে মিল থাকে না। যারা কথা বলে একরকম আর কাজ করে অন্যরকম তাদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেন-

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ. كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُوْلُوْا مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ.

অর্থ: হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা কেনো তা বলো যা তোমরা (বাস্তবে) করো না? আল্লাহর নিকট এটি একটি অত্যন্ত ক্রোধ উদ্রেককারী বিষয় যে, তোমরা বলবে এমন কথা যা (বাস্তবে) করোনা।

(ছফ/৬১ : ২, ৩)

তাই প্রত্যেক সালাত আদায়কারীর ভাল করে জানা দরকার, সালাতে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে সে কী বলছে বা স্বীকার করছে। সালাতের বাইরে যদি তার কাজ সেই অনুযায়ী না হয় তবে কুরআন বলেছেন, তাকে আল্লাহর অত্যন্ত ক্রোধে পড়তে হবে।

চলুন এখন জানা যাক, সালাতের পঠিত বিষয়ের শিক্ষাসমূহ কী?

১. সূরা ফাতেহা পড়া থেকে শিক্ষা

সালাতের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহা পুরোটি এবং অন্য যেকোন সূরার বড় একটি বা ছোট তিনটি আয়াত পড়তে হয়। একজন সালাত আদায়কারী ফরজ, ওয়াজেব ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ধরে প্রতিদিন ফজরে ৪ বার, জোহরে ১০ বার, আছরে ৪ বার, মাগরিবে ৫ বার, এশায় ৯ বার অর্থাৎ মোট ৩২ বার সূরা ফাতেহা পড়ে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ না হলে নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিদিন ৩২ বার এই সূরাটি পড়ার ব্যবস্থা করতেন না। রাসূল (সা.) বলেছেন, সূরা ফাতেহা হচ্ছে কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা। চলুন এখন দেখা যাক, সূরা ফাতেহাকে কেন এত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

আল মাকতাবুশ শামেলাহ: ইবনে মাযাহ, হাদীস নং ৩৭৮৪ এবং সহীহ মুসলিম ও সুনানে নাসায়ীতে উল্লিখিত ও আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে- সালাত হলো আল্লাহর সঙ্গে বান্দার সাক্ষাত ও প্রার্থনা। অর্থাৎ আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করা। আর ঐ প্রার্থনার সময় সালাত আদায়কারী ও আল্লাহর মধ্যে যে কথোপকথন হয়, সেটিই হলো সূরা ফাতিহা। সূরাটিতে আল্লাহর কথা উহ্য এবং বান্দার কথা লিপিবদ্ধ আকারে আছে। হাদীসক'খানির বক্তব্য এরূপ-

যখন বান্দাহ বলে, الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين তখন আল্লাহ বলেন- আমার বান্দাহ আমার প্রশংসা করলো। যখন বান্দাহ বলে, الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ তখন আল্লাহ বলেন-

আমার বান্দাহ আমার গুণ গাইলো। যখন বান্দাহ বলে, مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ তখন আল্লাহ বলেন- আমার বান্দাহ আমার গৌরব বর্ণনা করলো। যখন বান্দাহ বলে, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ তখন আল্লাহ বলেন- আমার ও বান্দাহর মধ্যে এটিই সম্পর্ক যে, সে শুধু আমারই দাসত্ব করবে এবং শুধু আমারই কাছে চাইবে। আর যখন বান্দাহ বলে, صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ . غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ তখন আল্লাহ বলেন- এটা আমার বান্দার জন্য রইলো। আর আমার বান্দাহর জন্য তাই যা সে চাইলো।

আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত গবেষণা চালিয়ে যেতে বলেছেন। যেমন আল্লাহ বলেছের-

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

অর্থ: আর এই যিকির (আল-কুরআন) তোমার প্রতি নাযিল করেছি যেন মানুষের জন্যে যা নাযিল করা হয়েছে তা তুমি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে তাদের বুঝিয়ে দিতে পার এবং তারা নিজেরাও তা (কুরআন ও সুন্নাহ) নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে।

(নাহল/১৬ : ৪৪)

উল্লেখিত হাদীসের বক্তব্যের সাথে আল্লাহর দেয়া জ্ঞানের উৎস Common sense এবং মুসলিম উম্মাহর বর্তমান কালের বাস্তব অবস্থা মেলালে সহজেই বুঝা যায় বর্তমান যুগে কথোপকথনটি হবে এরকম-

সালাত আদায়কারীর কথা

প্রার্থনার চিরসত্য একটি নিয়ম হলো- যার কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে প্রথমে তার প্রশংসামূলক কিছু কথা বলা। সালাতে দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারী তাই প্রথমে আল্লাহর প্রশংসামূলক তিনটি কথা বলে। যথা-

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ.

অর্থ: সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। (যিনি) পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু। (যিনি) বিচারদিনের সর্বময় ক্ষমতার আধিকারী।

ব্যাখ্যা: সালাত আদায়কারী বলছে- হে আল্লাহ, আমরা যে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও এ দুনিয়ায় বেঁচে থেকে আমাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারছি এর জন্যে সকল প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য শুধু আপনি। কোন নেতা, পীর, বুজুর্গ, চিকিৎসক ইত্যাদি নয়। এভাবে সালাত আদায়কারী তিনটি বিষয়ে স্বেচ্ছায় স্বীকৃতি দেয়-

১. আল্লাহ হচ্ছেন মহাবিশ্বের রব

আরবী ভাষায় রব শব্দটির তিন প্রকার অর্থ (ক) মনিব বা প্রভু (খ) লালন-পালনকারী বা তত্ত্বাবধায়ক (গ) আদেশদাতা, আইনদাতা, শাসক বা বিচারকর্তা। সালাত আদায়কারী এই সকল অর্থেই স্বেচ্ছায় আল্লাহকে স্বীকৃতি দেয়।

২. আল্লাহ পরম দয়ালু ও করুণাময়

বাস্তবতা হলো- রোগব্যাধি ও অন্য অসংখ্য প্রতিকূলতার মধ্যে আমরা যে এ দুনিয়ায় বেঁচে আছি এটি আল্লাহর দয়া। তিনি দয়া না করলে আমরা কেউই পরকালেও শান্তিতে থাকতে পারব না। তিনি মাফ করার জন্যেই বসে আছেন। শাস্তি দেয়ার জন্যে নয়। আমরা যদি কুরআনে বর্ণিত মৌলিক কাজগুলো অন্তত করতে পারি তবে তিনি ছোট-খাট সব গুনাহ মাফ করে দেবেন। এ কথা পবিত্র কুরআনে তিনি অনেকবার উল্লেখ করেছেন। আল্লাহকে দয়ালু ও করুণাময় বলার মাধ্যমে সালাত আদায়কারী স্বেচ্ছায় এ কথাগুলোরই স্বীকৃতি দেয়।

৩. আল্লাহ বিচার দিনের মালিক

এ কথা বলে সালাত আদায়কারী আল্লাহকে জানিয়ে দেয়- শেষ বিচারের দিনে সর্বময় কর্তৃত্ব থাকবে আল্লাহর। ইসলামের বড় নিষিদ্ধ কাজগুলো (কবীরা গুনাহ) থেকে মুক্ত না হয়ে আমরা যদি পরকালে চলে যাই তবে কোন পীর, বুজুর্গ, শহীদ, এমনকি নবীও আমাদেরকে বাঁচাতে পারবেন না। তাইতো রাসূল (সা.) নবুয়াত পেয়ে তাঁর প্রাণপ্রিয় মেয়ে ফাতেমাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, হে ফাতেমা, তুমি যদি আল্লাহর আনুগত্য না করো তবে সেই বিচার দিনে, তোমার পিতা আমি মুহাম্মাদও তোমাকে শাস্তি থেকে বাঁচাতে পারবো না। আল্লাহকে বিচার দিনের মালিক বলার মাধ্যমে সালাত আদায়কারী স্বেচ্ছায় এ কথাগুলোরই স্বীকৃতি দেয়।

আল্লাহর প্রশ্ন

সালাত আদায়কারীর প্রশংসামূলক কথা শুনে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেন- কে তুই আমার প্রশংসা করছিস? কী তোর পরিচয়?

সালাত আদায়কারীর জবাব

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ.

অর্থ: আমরা শুধু আপনারই দাসত্ব করি (দাসত্বের শর্তপূরণ করে জীবন পরিচালনা করি) এবং শুধু আপনারই কাছে সাহায্য চাই।

ব্যাখ্যা: সালাত আদায়কারীর তার পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমে বলছে- সে তাঁর একজন দাস। দাসত্ব করা মানে হুকুম মেনে চলা। যা হুকুম তাই আইন, আর যা আইন তাই হুকুম। তাই, সালাত আদায়কারী আল্লাহকে বলছে- আমি সেই ব্যক্তি, যে দিন-রাত ২৪ ঘণ্টা অন্য কারো নয়, শুধু আপনারই আইন (বিধান) মেনে চলি।

সালাত আদায়কারী আরো বলছে- আমি শুধু আপনার কাছে সাহায্য চাই। কারণ আমি জানি নেতা, পীর, বুজুর্গ কারোরই ক্ষমতা নেই, আপনার নিকট থেকে জোর করে কিছু আদায় করে দেয়ার। তাই পীর, বুজুর্গ বা অন্য কাউকে নজর-নেয়াজ বা অন্যভাবে ঘুষ দিয়ে খুশি করে তার দ্বারা আপনার নিকট থেকে কিছু আদায় করে নেয়ার মতবাদে আমি বিশ্বাস করি না।

আল্লাহর জিজ্ঞাসা

বেশ জানলাম তোর পরিচয়। এখন বল, তুই কী চাস?

সালাত আদায়কারীর উত্তর

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ.

অর্থ: আমাদেরকে স্থায়ীভাবে সঠিক পথ প্রদর্শন করুন।

ব্যাখ্যা: আল্লাহর তুই কী চাস প্রশ্নের উত্তরে সালাত আদায়কারী একটিমাত্র জিনিস চেয়েছে। তা হচ্ছে সঠিক পথ। লক্ষণীয় হলো- যে ব্যক্তি সঠিক পথের সন্ধান আল্লাহর কাছে চাচ্ছে তার পূর্বে বলা বা স্বীকার করা কয়েকটি কথা হলো-

- সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যে
- আল্লাহ মহাবিশ্বের রব
- আল্লাহ শেষ বিচার দিনের মালিক
- চব্বিশ ঘণ্টার জীবনে সে শুধু তাঁরই আইন মেনে চলে এবং শুধু তারই নিকট সাহায্য চায়

সালাত আদায়কারী কাফের (নাস্তিক), কমিউনিস্ট বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী নয়। সে একজন পাকা ঈমানদার মুসলিম এবং ইসলামকেই সে তার জীবন ব্যবস্থা হিসাবে বেছে নিয়েছে। তাহলে কেন সেই ব্যক্তি আল্লাহর কি চাস প্রশ্নের উত্তরে অন্য কিছু না চেয়ে সঠিক পথের সন্ধান চাইল? বেশ চিন্তার বিষয়, তাই না? আল্লাহর সাথে সালাত আদায়কারীর পরবর্তী কথোপকথনের মাধ্যমে ব্যাপারটা পরিস্কারভাবে বুঝা যায়।

আল্লাহর জিজ্ঞাসা

সালাত আদায়কারীর সঠিক পথ চাওয়ার উত্তরে আল্লাহ বলেছেন- আচ্ছা বান্দা, এতক্ষণের কথাবার্তায় তো বুঝা যায় তুই ইসলামের সঠিক পথেই আছিস। কিন্তু এরপরও তুই আমার নিকট সঠিক পথের সন্ধান চাচ্ছিস। এই সঠিক পথ বলতে তুই কী বুঝাতে চাচ্ছিস খুলে বলতো? (আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের মনের কথা জানেন। তাই তাঁর এ ধরনের প্রশ্ন করার কারণ হলো মানুষকে শেখানো)

সালাত আদায়কারীর জবাব

صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ.

অর্থ: তাদের পথে, যাদের আপনি অনুগ্রহ করেছেন। তাদের (পথ ব্যতীত) যাদের

উপর (আপনার) গজব পড়েছে এবং তাদেরও (পথ) নয় যারা পথভ্রষ্ট (হয়েছে)।

ব্যাখ্যা: আল্লাহ সঠিক পথের ব্যাখ্যা জানতে চাওয়াতে সালাত আদায়কারী বলছে- হে আল্লাহ, সঠিক পথ বলতে আমি ঐ পথ বুঝাতে চাচ্ছি, যে পথে চলে পূর্ববর্তীরা সফলকাম হয়েছেন এবং অভিশপ্ত বা পথভ্রষ্ট হননি। কারণ, আমি তো ইসলাম পালনের ব্যাপারে মুসলিমদের বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত দেখছি। যেমন-

- ♦ অলি-আওলিয়াদের অনুসারী দল,
- ♦ পীরদের অনুসারী দল,
- ♦ বুজুর্গদের অনুসারী দল,
- ♦ তাবলীগের অনুসারী দল,
- ♦ কংগ্রেসী, আওয়ামী, জাতীয়তাবাদী, ওলামাদের অনুসারী দল,
- ♦ আধ্যাত্মবাদীদের অনুসারী দল,
- ♦ ইসলামী রাজনৈতিক দলের অনুসারী দল ইত্যাদি।

প্রত্যেক দলের অনুসারীদের চেহারা ও বেশ-ভূষায় ইসলামের অনুসারী বলে মনে হয়। কাউকে কাউকে চেহারা ও বেশভূষা দেখে বিরাট কামেল লোক মনে হয়। আবার কথাবার্তায় প্রত্যেকে দাবি করেন তারাই সঠিক ইসলামের পথে আছেন, অন্যরা পথভ্রষ্ট। তাই আমি কাদের পথ অনুসরণ করবো এ ব্যাপারে ভীষণ দ্বন্দ্বে পড়ে গেছি। আর তাই পূর্বে যারা পুরস্কৃত হয়েছে, অভিশপ্ত বা পথভ্রষ্ট হয়নি, তাদের পথের সন্ধান আমি আপনার নিকট চাচ্ছি।

আল্লাহর উত্তর

বান্দাহ তোমরা এ বিপদে পড়বে এটি আমার জানা আছে। এ বিপদ হতে উদ্ধারের জন্যই আমি সালাতে সূরা ফাতেহা পড়ার পর কুরআনের অন্য কিছু অংশ পড়া বাধ্যতামূলক করে, কুরআন ভুলতে না পারার ব্যবস্হা করেছি। কারণ-

- ▪ সঠিক পথ হচ্ছে কুরআনের পথ। তাই, যাদের কুরআনের জ্ঞান আছে তারা সহজেই বুঝতে পারবে কোন দল সঠিক পথে ও কোন দল ভুল পথে আছে। অর্থাৎ কাদের অনুসরণ করা যাবে ও কাদের অনুসরণ করা যাবে না।
- ▪ আর ঐ কুরআনে আমি বলে রেখেছি-

  اِتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ

  অর্থ: তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদের উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তোমরা তার অনুসরণ করো এবং তাকে ছাড়া অন্য ওলী-আওলিয়াকে অনুসরণ করো না।

  (আ'রাফ/৭ : ৩)

আর তাইতো আমি ৪ ও ৩ রাকায়াতওয়ালা ফরজ সালাতের শেষ ২ ও ১ রাকাত বাদে সকল সালাতের প্রতি রাকায়াতে সূরা ফাতিহার পর কুরআনের ১টি বড় বা ৩টি

ছোট আয়াত পড়ার বিধান রেখেছি। যেন সালাত আদায়কারী কোনভাবে কুরআনের বক্তব্য ভুলে যেতে না পারে।

সুধী পাঠক, চিন্তা করে দেখুন সালাতে দাঁড়িয়ে সূরা ফাতেহার মাধ্যমে প্রতিদিন অন্তত ৩২ বার আল্লাহর সঙ্গে আমাদের কী কথোপকথন হচ্ছে। কী অপূর্ব উপায়ে আল্লাহ আমাদের ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মৌলিক বিষয় এবং ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নেয়ার সব থেকে মারাত্মক উপায় থেকে বাঁচার পথ বলে দিয়েছেন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে এটি সোজাসুজি বলে দিতে পারতেন। কিন্তু মানুষরা যাতে সহজে বুঝতে পারে, তাই তিনি প্রশ্ন করে কথোপকথনের মাধ্যমে বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছেন।

২. কুরআনের অন্য আয়াতসমূহ পড়া থেকে শিক্ষা

সালাতের প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহার পর কুরআনের অন্তত একটি বড় আয়াত বা ৩টি ছোট আয়াত অবশ্যই পড়তে হয়। কেন আল্লাহ এ বাধ্যতামূলক ব্যবস্থাটি করেছেন, তা আজ বিশ্ব মুসলমানদের আবার ভাল করে বুঝতে হবে এবং সেই অনুযায়ী তাদের কর্মপদ্ধতি শুধরিয়ে নিতে হবে। যদি তারা আবার দুনিয়ায় বিজয়ী হতে চায় এবং পরকালে শান্তিতে থাকতে চায়। ব্যাপারটি ভালভাবে বুঝতে হলে কুরআনে বর্ণিত মানুষ সৃষ্টির গোড়ার কথা থেকে শুরু করতে হবে।

আল্লাহ আদম (আ.) কে সৃষ্টি করে ফেরেশতাদের এবং জীন-ইবলিসকে তাকে সেজদা করতে বললেন। সকল ফেরেশতারা আদম (আ.) কে সেজদা করল কিন্তু ইবলিস অহংকার করে সেজদা করল না। এতে আল্লাহ তাকে শয়তান হিসাবে ঘোষণা দিলেন। ইবলিস তখন আল্লাহকে বললো- আল্লাহ, আমিও আদম ও তার বংশধরদের ইসলামের পথ থেকে বিপথে নিতে সর্বাত্মক চেষ্টা করব। আর এই কাজ করার জন্যে ইবলিস দু'টো জিনিস আল্লাহর নিকট দাবি করলো-

১. কেয়ামত পর্যন্ত আয়ু
২. যে কোন স্থানে যাওয়ার এবং যে কোন রূপ ধারণ করার ক্ষমতা।

আল্লাহ ইবলিসকে বললেন- ঠিক আছে, তোর দু'টো দাবিই আমি পূরণ করব। কিন্তু তুই জোর করে বা বাধ্য করে মানুষকে বিপথে নিতে পারবি না। শুধু ধোঁকা দিয়ে তাদের বিপথে নেয়ার চেষ্টা করতে পারবি। আল্লাহ এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে ইবলিস তার কর্মকৌশল ঠিক করে নিল। সে ঠিক করলো- যেহেতু তাকে শুধু ধোঁকাবাজি বা প্রতারণার মাধ্যমে মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে সরানোর ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তাই তাকে কাজ করতে হবে, মানুষের বন্ধু বা কল্যাণকামীর ছদ্মবেশে।

আল্লাহ আদম (আ.) ও বিবি হাওয়াকে বেহেশতে থাকতে দিলেন এবং একটি গাছের ফল ছাড়া আর যা কিছু ইচ্ছা খেতে বললেন। ইবলিস তার কাজ শুরু করে দিল। সে বন্ধু সেজে আদম (আ.) ও বিবি হাওয়ার কাছে গেল এবং বললো- আদম, জানো আল্লাহ কেন তোমাদের ঐ গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছেন? ঐ ফল খেলে

তোমরা অমর হয়ে যাবে এবং চিরকাল এই বেহেশতে থাকতে পারবে, তাই আল্লাহ তোমাদের ঐ গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছেন। এভাবে ইবলিস কল্যাণের কথা বলে আদম (আ.) ও বিবি হাওয়াকে নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার জন্যে উদ্বুদ্ধ করল এবং আদম (আ.) ও বিবি হাওয়া কল্যাণ হবে মনে করে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেললেন। নিষিদ্ধ ফল খাওয়ার পরই কিছু নিদর্শন দেখে আদম (আ.) বুঝতে পারলেন অন্যায় কাজ করা হয়ে গেছে। তাই সাথে সাথে তাঁরা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তাঁদের ক্ষমা করে দিলেন। কিন্তু জানিয়ে দিলেন- তাঁরা আর বেহেশতে থাকতে পারবে না। কিছু সময়ের জন্যে তাঁদের দুনিয়াতে থাকতে হবে এবং সেখানে শয়তানও তাঁদের সঙ্গে থাকবে। শয়তানও দুনিয়ায় তাঁদের সঙ্গে যাবে শুনে আদম (আ.) ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কারণ, শয়তানের ধোঁকা বুঝা কত কঠিন সে অভিজ্ঞতা তাঁর ইতোমধ্যে হয়ে গেছে। তাই আদম (আ.) এটা ভেবে মহাচিন্তায় পড়লেন যে- শয়তান যদি পৃথিবীতে যায় তবে তো সে ধোঁকা খাটিয়ে তাঁর সকল বংশধরকে বিপথে নিয়ে যাবে। আদম (আ.) এর ঐ দুশ্চিন্তা বুঝতে পেরে আল্লাহ জানালেন-

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

অর্থ: এরপর আমার নিকট থেকে তোমাদের কাছে পথনির্দেশিকা যাবে, তখন যারা আমার সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কারণ থাকবে না।

(বাকারাহ/২ : ৩৮)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ আদম (আ.) এর চিন্তা দেখে বলেন- তোমার দু:শ্চিন্তার কোন কারণ নেই। নবী-রাসূলদের মাধ্যমে আমি কিতাব আকারে যুগে যুগে জীবন বিধান পাঠাবো। তোমার বংশধরদের মধ্যে যারা সেই জীবন বিধান মেনে চলবে তাদের কোন ভয় নেই।

আল্লাহর এ কথা জেনেই ইবলিস মুসলমানদের ইসলাম থেকে বিপথে নেয়ার জন্যে তার এক নম্বর কাজটি ঠিক করে ফেললো। আর তা হলো, মুসলিমদের বিভিন্নভাবে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান থেকে দূরে রাখা। কারণ, এটি করতে পারলে বন্ধু বা কল্যাণকামী সেজে, যেকোন কথা বা কাজকে ইসলামের কথা বা কাজ বলে চালিয়ে দিয়ে অতি সহজে সে মুসলিমদের ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

আল্লাহ ইবলিসের ঐ এক নম্বর কর্মপন্থাকে বিফল করে দেয়ার জন্যে ব্যবস্থা নিলেন। শেষ নবীর উম্মতের জন্যে আল্লাহর সেই ব্যবস্থা হচ্ছে সালাতের প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহার পর কুরআনের অন্তত একটি বড় আয়াত বা তিনটি ছোট আয়াত বাধ্যতামূলকভাবে পড়া। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে আল্লাহ নিম্নোক্তভাবে মুসলিমদের শয়তানের এক নম্বর কর্মপন্থা থেকে বাঁচার ব্যবস্থা করেছেন-

১. সালাতের বাইরেও প্রতিদিন কিছু কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে এটি শিক্ষা দেয়া। এর ফলে মুসলিমদের ইসলামের মূল বা প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয় নির্ভুল তথ্য থেকে সরাসরি জানতে পারবে।

২. সালাতে পুন: পুন: পড়ার (Revision) মাধ্যমে মুসলিমদের কুরআনের বক্তব্য কোনক্রমেই ভুলে না যাওয়ার ব্যবস্থা করা।

পবিত্র কুরআনের মোট আয়াত সংখ্যা (কম/বেশি) ৬,২৩৪ টি। এর মধ্যে কোন্ আয়াতগুলো সব থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ সে ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন-

هُوَ الَّذِيْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ

অর্থ: তিনিই তোমার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, এর মধ্যে কিছু হলো 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য' আয়াত, এগুলো কিতাবের মা (মূল), আর অন্যগুলো 'অতীন্দ্রিয়'।

(আলে ইমরান/৩ : ৭)

ব্যাখ্যা: মুহকামাত আয়াত হচ্ছে কুরআনের সেই সব স্পষ্ট আয়াত যার অর্থ বুঝা খুব সহজ বা যার অর্থ বুঝতে কোন কষ্ট হয় না। এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে ইসলামের বুনিয়াদী নীতিসমূহ। যথা- আকায়েদ (বিশ্বাস-প্রত্যয়), ইবাদাত (উপাসনা-আনুগত্য), আখলাক (নৈতিকতা-চরিত্রনীতি), ফারায়েজ (অবশ্য পালনীয় কর্তব্য) এবং আমর ও নাহী (আদেশ ও নিষেধ)। এ জন্যে এই আয়াতগুলোকে আল্লাহ কুরআনের **'মা'** বলে উল্লেখ করছেন।

কুরআনের সূরা ফাতেহার ৭টি আয়াত বাদ দিলে মোট আয়াত সংখ্যা ৬,২২৭ টি। আর মুহকামাত আয়াতের সংখ্যা প্রায় ৫শ'টি। প্রতিদিনে ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদাসহ ৩২ রাকাত সালাতের ২৫ রাকাতে সূরা ফাতেহার পরে অন্য আয়াত পড়তে হয়। প্রতি রাকাতে ১টি বা ৩টি করে আয়াত পড়লেও প্রতি ৭ থেকে ২০ দিনের মধ্যে মুহকামাত আয়াতগুলো একবার পড়া হয়ে যায়। আর প্রতি ৮৪ থেকে ২৫০ দিনের মধ্যে পুরো কুরআন পড়া হয়ে যায়।

চিন্তা করে দেখুন, ইসলামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়গুলো সর্বোচ্চ ৭ থেকে ২০ দিনের মধ্যে নির্ভুল উৎস থেকে পুন:পড়ার (Rivision) কী অভূতপূর্ব ব্যবস্থাই না আল্লাহ করেছেন! এর মাধ্যমে আল্লাহ এটিই নিশ্চিত করতে চেয়েছেন যে-মুসলিমরা যেন তাদের জীবন-বিধানের প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়গুলো কোনক্রমে ভুলে যেতে না পারে। ফলে শয়তান বন্ধু বা কল্যাণকামী সেজে এসেও যেন তাদের অন্তত ঐ বিষয়গুলোর ব্যাপারে কোনক্রমেই ধোঁকা দিতে না পারে। আর কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, ইবলিস শয়তানের ১নং কাজই হচ্ছে মানুষকে কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে রাখা।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, মহান আল্লাহর এত সব অপূর্ব ব্যবস্থাকে প্রায় শতভাগ ব্যর্থ করে দিয়ে ইবলিস শয়তান তার এক নম্বর কাজে আজ প্রায় ১০০% সফল।

এটি শয়তান শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে করেনি। সে তা করেছে কুরআনের জ্ঞান অর্জনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত নানা রকম ধোঁকাবাজিমূলক কথা মুসলমান সমাজ তথা মানুষের মধ্যে চালু করে দিয়ে। সে সকল ধোঁকাবাজিমূলক কথা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে **'মু'মিনের এক নম্বর কাজ ও শয়তানের এক নম্বর কাজ'** নামক বইটিতে।

৩. তাসবীহ পড়া থেকে শিক্ষা

সালাতে পড়া সকল তাসবীহ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে বইটির কলেবর বড় হয়ে যাবে। তাই যে তাসবীহটি আমরা সালাতে সর্বাধিক বার পড়ি, শুধু সেটি নিয়ে কিছু আলোচনা করে পুস্তিকাটি শেষ করতে চাই।

সালাতে সর্বাধিক বার যে তাসবীহটি পড়তে হয় তা হলো-

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلَى/سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمُ.

প্রতি ২ রাকাত সালাত আদায়কারী কমপক্ষে ১৯ বার سُبْحَانَ তাসবীহটি বলেন। সানায় ১ বার, রুকুতে ৩ বার এবং ২ সিজদায় ৬ বার। অর্থাৎ প্রতিদিনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে কমপক্ষে ২৯৯ বার এই সুবহানা তাসবীহটি আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীকে পড়তে হয়। আল্লাহ কি বিনা কারণে প্রতিদিন ২৯৯ বার এই কথাটি সালাত আদায়কারীর মুখ দিয়ে বলিয়ে নিচ্ছেন? না, তা অবশ্যই নয়। কথাটি মুসলিমদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সালাতে দাঁড় করিয়ে তিনি মুসলিমদের মুখ দিয়ে ২৯৯ বার কথাটি বলিয়ে নিয়েছেন। চলুন এবার দেখা যাক, আল্লাহ সুবহানা শব্দটির দ্বারা সালাত আদায়কারীর মুখ দিয়ে কি স্বীকার করিয়ে নিচ্ছেন।

সুবহানা শব্দটির শাব্দিক অর্থ হচ্ছে পবিত্র (মুক্ত)। কুরআনের যত আয়াতে সুবহানা শব্দটি আছে, সেগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়- এই শব্দটি দ্বারা আল্লাহ বুঝাতে চেয়েছেন, তিনি শিরক থেকে পবিত্র। তাই তাসবীহটির মাধ্যমে সালাত আদায়কারী আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে স্বেচ্ছায় স্বীকৃতি দেয় যে- আল্লাহ শিরক থেকে পবিত্র। অর্থাৎ সালাতে আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিটি সালাত আদায়কারী দিনে ২৯৯ বার অঙ্গীকার করছে যে- বাস্তব জীবনে সে শিরক করবে না। আল্লাহ জানেন, শিরক দুনিয়া ও আখিরাতের জন্যে অতীব ক্ষতিকর একটি বিষয়। তাই তিনি প্রতিদিন ২৯৯ বার কথাটি সালাত আদায়কারীর কাছ থেকে স্বীকার করিয়ে নিয়ে এ তথ্যটিই জানাতে চেয়েছেন যে- তারা যেন তাদের বাস্তব জীবনে শিরকের গুনাহ থেকে অবশ্যই মুক্ত থাকে।

তাহলে শিরক কি এবং কি কি কাজ করলে শিরক করা হয়, প্রতিটি মুসলিমের এ ব্যাপারে অত্যন্ত পরিস্কার ধারণা থাকা দরকার। শিরক শব্দের অর্থ হচ্ছে অংশীদারীত্ব। তাই আল্লাহর সাথে শিরক করার অর্থ হচ্ছে- যে সব বিষয় শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত সে সব বিষয়ে অন্য কারো অংশীদারত্ব আছে এ কথা বলা

বা স্বীকার করা অথবা বাস্তবে এমন কাজ করা যাতে বুঝা যায়, ঐ সব বিষয়ে আল্লাহর সঙ্গে অন্যের অংশীদারত্ব স্বীকার করে নেয়া হয়েছে।

চলুন এবার দেখা যাক, শিরক কয় প্রকার এবং বর্তমানকালে মুসলিমরা কোন্ কোন্ শিরক কি পরিমাণে করছে-

শিরকের শ্রেণীবিভাগ

১. আল্লাহর সত্তার সাথে শিরক

এটি হচ্ছে আল্লাহ একের অধিক বা তাঁর স্ত্রী, ছেলে, মেয়ে ইত্যাদি আছে এ কথা বলা বা স্বীকার করা। মুসলিমরা এ ধরনের শিরক থেকে মুক্ত বলা চলে।

২. আল্লাহর গুণাবলীর সাথে শিরক

এটি হচ্ছে, যে সকল গুণ শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত সে গুণ অন্য কারো আছে এটি বলা, স্বীকার করা বা সে অনুযায়ী কাজ করা। যেমন- সব জায়গায় উপস্থিত থাকা, সব কথা শুনতে পাওয়া, গায়েব জানা ইত্যাদি গুণ শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্ধারিত। অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্তার এই রকম গুণ আছে এটি মনে করা বা সেই অনুযায়ী কাজ করা শিরক। চাই সে ব্যক্তি বা সত্তা জীবিত বা মৃত কোন নবী-রাসূল (আ.), অলি-আউলিয়া, পীর, বুজুর্গ বা অন্য কেউ হোক না কেন। এ ধরনের শিরক বর্তমানকালের মুসলিমদের মধ্যে বেশ দেখা যায়।

৩. আল্লাহর হক বা অধিকারের সাথে শিরক

যে সকল জিনিস পাওয়ার হক শুধুমাত্র আল্লাহর, তা অন্য কাউকে দিলে বা অন্য কারো তা পাওয়ার হক আছে এ কথা স্বীকার করলে এ ধরণের শিরক করা হবে। যেমন- সেজদা পাওয়ার হক শুধুমাত্র আল্লাহর। তাই কেউ যদি কোন মাজারে বা অন্য কোথাও গিয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করে, তবে সে শিরক করল। এ ধরনের শিরক মুসলিমদের মধ্যে বর্তমানে কম হলেও আছে।

৪. আল্লাহর ক্ষমতার সাথে শিরক

এ ধরনের শিরক দু'প্রকার হয়ে থাকে

ক. আল্লাহর সাধারণ ক্ষমতার সাথে শিরক

হায়াত, মউত, রিজিক, ধন-দৌলত, সম্মান, সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি দেয়া এবং গুনাহ মাফ করার স্বাধীন ক্ষমতা শুধু আল্লাহর। পৃথিবীর জীবিত বা মৃত কোন ব্যক্তি বা সত্তার আল্লাহর নিকট থেকে ঐগুলো জোর করে এনে দেয়ার বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নেই। কেউ যদি মনে করে জীবিত বা মৃত কোন ব্যক্তি বা সত্তার, আল্লাহর নিকট থেকে জোর করে বা আল্লাহকে বাধ্য করে অথবা ইচ্ছে করলেই আল্লাহকে অনুরোধ করে ঐগুলো আদায় করে দেয়ার ক্ষমতা রাখে, তাহলে নি:সন্দেহে আল্লাহর সাধারণ ক্ষমতার সঙ্গে শিরক করা হবে।

মানুষ ক্ষমতাবান কোন ব্যক্তির নিকট থেকে কিছু জিনিস এনে দিতে পারবে এ আশায় শুধু দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির পেছনে অর্থ-সম্পদ বা শ্রম ব্যয় করে। সে ধরে

নেয়- দ্বিতীয় ব্যক্তি খুশি হয়ে চেষ্টা করলে ক্ষমতাবান ব্যক্তি বা সত্তার নিকট থেকে অবশ্যই তার কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি এনে দিতে পারবে। তদ্রূপ, আল্লাহর নিকট থেকে কিছু পাওয়ার আশায় জীবিত বা মৃত কোন ব্যক্তিকে (পীর, বুজুর্গ, দরবেশ ইত্যাদি) নজর-নিয়াজ বা শ্রম (হাত-পা টিপা) মানুষ শুধু তখনই দেয়, যখন সে বিশ্বাস করে, ঐ ব্যক্তি খুশি হয়ে চেষ্টা করলে তার কাঙ্ক্ষিত বস্তুটি আল্লাহর নিকট থেকে অবশ্যই এনে দিতে পারবে। এটি অবশ্যই শিরক। বর্তমান মুসলমান সমাজে এই ধরনের শিরক কম-বেশি চালু আছে।

খ. আল্লাহর আইন বানানোর ক্ষমতার সাথে শিরক

আল কুরআনের সূরা ইউসুফের ৪০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন-

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

অর্থ: হুকুম করার ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহর।

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ এই আয়াত ও আরো আয়াতের মাধ্যমে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা দিচ্ছেন যে- হুকুম করার ক্ষমতা শুধুমাত্র তাঁর। হুকুম মানে আইন, আবার আইন মানে হুকুম। তাহলে আল্লাহ এখানে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছেন যে- আইন বানানোর সার্বভৌম বা স্বাধীন ক্ষমতা শুধু তাঁর। পৃথিবীর আর কোন সত্তার আইন বানানোর ব্যাপারে সার্বভৌম বা স্বাধীন ক্ষমতা নেই। চাই সে সত্তা আইন পরিষদ (Parliament), সিনেট, হাউজ অব কমন্স, হাউজ অব লর্ডস, লোকসভা, প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, বাদশাহ যেই হোক না কেন। এই সব সত্তার আইন প্রণয়নের ব্যাপারে ক্ষমতা শুধু এতটুকু যে, যে সকল ব্যাপারে আল্লাহ কোন স্পষ্ট বিধান দেননি, সেগুলোর ব্যাপারে আইন প্রণয়ন করা। কিন্তু তা অবশ্যই আল্লাহর দেয়া কোন স্পষ্ট আইনের পরিপন্থী হতে পারবে না। কেউ যদি ঐ সব সংস্থা বা সত্তা আইন প্রণয়নের ব্যাপারে স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী, এ কথা ভোট বা সমর্থনের মাধ্যমে স্বীকার করে নেয় বা তাদের বানানো (আল্লাহর আইনের বিরোধী) আইনকে খুশি মনে মেনে চলে, তবে সে অবশ্যই আল্লাহর আইন বানানোর ক্ষমতার সাথে শিরক করল।

মানুষের জীবন পরিচালনার আইনগুলো বানিয়ে আল্লাহ তা জানিয়ে দিয়েছেন আল কুরআনের মাধ্যমে। আর রাসূল (সা.) সেগুলো বাস্তবে রূপদান করে মানুষকে দেখিয়ে দিয়েছেন। তাই কুরআনে বলা আছে, এমন হুকুম বা আইনের পরিপন্থী কোন আইন বানানোর ক্ষমতা কোন সত্তা বা সংস্থার নেই। যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা এরকম আইন প্রণয়ন করে এবং তা মানুষকে মানতে বাধ্য করে, কুরআনের ভাষায় তাদের বলা হয়েছে 'তাগুত'। এটি হচ্ছে ইসলামকে অস্বীকার করার তিন পর্যায়ের (সাধারণ কাফির, তাগুত কাফির এবং মুনাফিক) মধ্যম পর্যায়। আর যে সব মুসলিম ইসলাম বিরোধী আইন প্রণয়নের জন্যে ভোট বা সমর্থনের মাধ্যমে তাগুতকে ক্ষমতায় বসায় বা খুশি মনে তাগুতের বানানো আইন মেনে চলে, তারা নি:সন্দেহে নিজেদের ঐ পর্যায়ের কুফরীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে।

এটিই হচ্ছে সেই শিরক, যেটি বর্তমান বিশ্বে মুসলিমরা সব চেয়ে বেশি করছে। বর্তমানে বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর ২/১টি ছাড়া সব ক'টিতে কুরআন বিরোধী আইন চালু আছে। অধিকাংশ মুসলিম সমর্থন করেছে বলেই এটি চালু হতে পেরেছে। আর বেশির ভাগ মুসলিম খুশি মনে, মেনে চলছে বলে এটি চালু থাকতে পারছে। তাই না বুঝে হোক, আর বুঝে হোক পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম আজ এই শিরকটি করছে, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

কুরআনে বর্ণিত আইন-কানুন বা বিধি-বিধানগুলো যে কত যুক্তিসঙ্গত মানবকল্যাণমূলক তা যে কেউ একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লে এবং চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন। ঐ বিধি-বিধানগুলোর মাত্র ১৪টি উল্লেখ করা হয়েছে **'রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণের মাপকাঠি'** নামক বইয়ে। ঐ ১৪টি বিধানও যদি সঠিকভাবে কোন দেশে চালু করা যায়, তবে সে দেশটি যে একটি শান্তিময় দেশ হয়ে যাবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

৪. দোয়া থেকে শিক্ষা

সালাতে পড়া অন্যান্য তাসবীহ ও দোয়ার মাধ্যমেও আল্লাহ সালাত আদায়কারীর মুখ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলিয়ে বা স্বীকার করিয়ে নেন। তাই প্রতিটি সালাত আদায়কারীর সালাতে পড়া প্রতিটি তাসবীহ ও দোয়ার অর্থ ও ব্যাখ্যা ভাল করে জানা ও বুঝা উচিত এবং তাদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডেও তার প্রতিফলন হওয়া উচিত। অন্যথায় আল্লাহর শাস্তি থেকে তাদের কেউই উদ্ধার করতে পারবে না।

সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী নামক উপাসনামূলক ইবাদাতগুলো এবং মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের মধ্যে সম্পর্ক

বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের দুরবস্থার অন্যতম প্রধান একটি কারণ হলো- সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী নামক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতগুলো এবং আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের মধ্যকার সম্পর্ক না জানা বা এ ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা না থাকা।

মানুষ সৃষ্টির আল্লাহর উদ্দেশ্য হচ্ছে, 'আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা'। এটি **'মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য'** শিরোনামের বইটিতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। মানুষ সৃষ্টির এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের একমাত্র পথ হলো- ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে বিজয়ীশক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা। আর এটিই হলো, নবী-রাসূল (আ.) পাঠানোর আল্লাহর উদ্দেশ্য। এ বিষয়টি **'রাসূল মুহাম্মাদ (সা.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণের মাপকাঠি'** নামক বইটিত বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সুধী পাঠক, আমরা মানুষেরা যখন কোন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করি তখন প্রথমে ঐ উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী লোক তৈরি করার জন্যে একটি প্রোগ্রাম তৈরি করি। এ বক্তব্য যে চিরসত্য (Eternal Truth), তা আশা করি আপনারা সবাই স্বীকার করবেন। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি আরো পরিস্কার হবে। ধরুন, 'দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা'। পৃথিবীতে যত সরকার আছে তাদের সবারই এটি একটি প্রধান উদ্দেশ্য। আর এই উদ্দেশ্য সুষ্ঠুভাবে সাধন করার জন্যে, পৃথিবীর সকল সরকারই উপযুক্ত প্রোগ্রামের মাধ্যমে একটি দক্ষ বাহিনী গড়ে তোলে যাকে প্রতিরক্ষা বাহিনী বলা হয়। ঠিক এভাবেই, পৃথিবীর মানুষ যখনই কোন উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছে, তখনই প্রথমে সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে উপযুক্ত প্রোগ্রামের মাধ্যমে যোগ্য লোক বা জনশক্তি তৈরি করেছে।

আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে কুরআনে বর্ণিত সকল ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। এই কঠিন কাজটি করার জন্যেও তাই আগে উপযুক্ত লোক তৈরি করা দরকার। কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে মানুষের মাথায় যদি এ বুদ্ধি এসে থাকে, তবে সেই মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর জ্ঞানে এ বুদ্ধি আসেনি- এ কথা চিন্তা করাও মহাপাপ। তাই আল্লাহ যে উদ্দেশ্যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, সেই উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী লোক তৈরি করার প্রোগ্রামও তিনি অবশ্যই দিয়েছেন। আল্লাহর সেই প্রোগ্রাম হলো- সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ও কুরবাণী। এই পাঁচটি আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের প্রতিটির উদ্দেশ্য জেনে, তার অনুষ্ঠানটি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে তা থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো যদি মানুষ বুঝে-শুনে, মনে-প্রাণে গ্রহণ করে এবং তারপর সেই শিক্ষাকে তাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রয়োগ করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়, তবেই এমন লোকবল তৈরি হবে যারা আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের উপযোগী হবে। এটিই হচ্ছে কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense অনুযায়ী মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সঙ্গে সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ও কুরবাণীর সম্পর্ক।

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং এই পাঁচটি আমলের মধ্যকার এই সম্পর্ক বুঝে নিয়ে মুসলিমরা যতোদিন আমলগুলো পালন করেছিল এবং তাদের সকল কর্মকাণ্ড সে অনুযায়ী পরিচালনা করেছিল, ততোদিন তারা পৃথিবীতে সকল দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ ও বিজয়ী ছিল। পরবর্তীতে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense -এর পরিবর্তে ব্যক্তিবিশেষের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এ কারণে, অধিকাংশ সাধারণ মুসলিম তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যের সাথে এ পাঁচটি আমলের সম্পর্কের বিষয়ে কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense বর্ণিত বক্তব্য থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। তাই মুসলিমরা যদি আবার পৃথিবীতে সব দিকে শ্রেষ্ঠ ও বিজয়ী হতে চায়, তবে আবার তাদের ঐ সব ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense -এর দিকে সরাসরিভাবে ফিরে আসতে হবে।

আনুষ্ঠানিক উপাসনাগুলোর মধ্যে সালাতকে অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়ার কারণ

আনুষ্ঠানিক উপাসনাগুলো থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সালাত থেকে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিকভাবে যত ব্যাপক শিক্ষা পাওয়া যায় অন্য চারটি থেকে তেমনটি নয়। ঐ শিক্ষাগুলোই যদি ব্যক্তি বা সমাজ জীবনে উপস্থিত থাকে তবে সেখানে ইসলাম বিরুদ্ধ কোন কাজ উপস্থিত থাকতে পারে না এবং সে সমাজ একটি সুখী, সমৃদ্ধ, সুশৃঙ্খল ও প্রগতিশীল সমাজ হতে বাধ্য।

সালাতের উদ্দেশ্য হলো- মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন থেকে ইসলামের দৃষ্টিতে অশ্লীল ও অন্যায় কাজ দূর করা। কোন সমাজ থেকে ইসলামের দৃষ্টিতে অশ্লীল ও নিষিদ্ধ বিষয়গুলো দূর হয়ে গেলে সে স্থান শূন্য থাকবে না। সে স্থান ইসলামের দৃষ্টিতে সিদ্ধ ও অশ্লীল নয় এমন কাজে ভরপুর হয়ে যাবে। তাই, কোন ব্যক্তি ও সমাজে সালাতের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হয়ে গেলে সেখানে আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়ে যাবে। আর এটি সম্ভব হবে মুসলিমরা যদি সালাত কায়েম (প্রতিষ্ঠা) করে। এ জন্যেই সালাতকে ইসলামী জীবনবিধানে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

সালাত এবং রাসূল (সা.), সাহাবায়ে কিরাম ও ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলিমদের ব্যক্তি ও সামাজিক অবস্থা

রাসূল (সা.), সাহাবায়েকেরাম ও ইসলামের প্রাথমিক যুগের মুসলিমগণ সালাতকে শুধু অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে পালন করেননি। তারা সালাতের প্রতিটি অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে তা থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নিয়ে সে শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সুনিপুণভাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এটি সহজেই বুঝা যায় ঐ সময়কার ব্যক্তি ও সমাজের অবস্থা পর্যালোচনা করলে। ঐ সময়ে মুসলিমদের ব্যক্তি ও সমাজ থেকে ইসলামের দৃষ্টিতে যে সকল কাজ অশ্লীল ও নিষিদ্ধ তা সমূলে উৎপাটিত হয়ে গিয়েছিল। সে সময়কার ইতিহাস যিনি জানেন তিনি এক বাক্যে এটি স্বীকার করবেন।

সালাত কবুল হওয়ার সার্বিক শর্তসমূহ

কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense অনুযায়ী যে কোন আনুষ্ঠানিক আমল (কাজ) কবুল হওয়ার শর্তসমূহ হলো-

১. আমলটি করার সময় আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সর্বোক্ষণ সামনে রাখা।

২. আমলটির ব্যাপারে আল্লাহর বলে দেয়া উদ্দেশ্য জানা এবং আমলটি করার মাধ্যমে ঐ উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে বা হবে কিনা তা সবসময় খেয়াল রাখা।

৩. আল্লাহর জানিয়ে দেয়া পাথেয়কে আমলটির উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হিসেবে পালন করা

৪. আল্লাহ তা'য়ালা বা রাসূল (সা.) এর জানিয়ে দেয়া পদ্ধতি অনুযায়ী আমলটি করা।

৫. আমলটি আনুষ্ঠানিক হলে- প্রতিটি অনুষ্ঠান থেকে আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নেয়া

৬. আমলটি আনুষ্ঠানিক হলে- অনুষ্ঠান থেকে নেয়া শিক্ষাগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করা

৭. আমলটি ব্যাপক হলে- আল্লাহর জানিয়ে দেয়া মৌলিক বিষয়ের একটিও বাদ না দেয়া

৮. আমলটি ব্যাপক হলে- গুরুত্বের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে কর্মকাণ্ডটির বিষয়গুলো পালন করা

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে- **'আমল কবুলের শর্তসমূহ নামক'** বইটিতে।

সালাত কোন ব্যাপক বিষয় নয়। তবে এটি একটি আনুষ্ঠানিক বিষয়। তাই সালাত কবুল হওয়ার শর্তসমূহ হবে নিম্নের ছয়টি-

১. সালাত আদায় করার সময় আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সর্বোক্ষণ সামনে রাখতে হবে

২. সালাতের ব্যাপারে আল্লাহর জানিয়ে দেয়া উদ্দেশ্য জানা এবং সালাত আদায় করার মাধ্যমে ঐ উদ্দেশ্য সাধন হচ্ছে বা হবে কিনা তা সবসময় খেয়াল রাখা

৩. আল্লাহর জানিয়ে দেয়া পাথেয়কে (সালাতের অনুষ্ঠান) সালাতের উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম হিসেবে পালন করা

৪. আল্লাহ তা'য়ালা বা রাসূল (সা.) এর জানিয়ে দেয়া পদ্ধতি অনুযায়ী সালাতের অনুষ্ঠানটি পালন করা

৫. সালাতের অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো মনে-প্রাণে গ্রহন করা

৬. সালাতের অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় থেকে নেয়া শিক্ষাগুলো বাস্তবে প্রয়োগ করা

বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের সালাত আদায় করা ও আদায়কারীগণের বাস্তব আমল দেখলে তাদের কয়জনের সালাত কবুল হচ্ছে তা বুঝা মোটেই কোন কঠিন বিষয় নয়।

শেষ কথা

রাসূল (সা.) ও সাহাবায়েকেরাম দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর কয়েকশত বছর পর্যন্ত সালাতের শিক্ষা অনুযায়ী মুসলিমদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবন পরিচালিত হয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে সালাতের শিক্ষাগুলোর গুরুত্ব কমিয়ে তার অনুষ্ঠানকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বেশি। বর্তমান মুসলিমবিশ্বে সালাত শুধু একটি অনুষ্ঠানসর্বস্ব ইবাদাত বা কাজ। সালাতের অনুষ্ঠানটি সঠিকভাবে শিক্ষা দেয়ার ব্যাপারে মক্তব, মাদ্রাসা, মসজিদ, তাবলীগ জামাত, বিভিন্ন ইসলামী দল নানাভাবে চেষ্টা করে

থাকে। এটি অবশ্যই দরকার। কিন্তু পাশাপাশি যখন দেখি সালাত কায়েম করা কথাটি প্রকৃত অর্থ এবং সালাতের শিক্ষাগুলো সম্বন্ধে একেবারেই কোন জ্ঞান দেয়া হচ্ছে না বা আলোচনা করা হচ্ছে না, তখন শুধু অবাক হই এবং মনটা অত্যন্ত দু:খ ভারাক্রান্তও হয়ে যায়, শয়তানের কৃতকার্যতা দেখে। কারণ, সূরা বাকারার ১৭৭ নং আয়াতে আল্লাহ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, সালাতকে শুধু অনুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে পালন করাতে কোন সওয়াব নেই, সওয়াব আছে সালাত কায়েম করার মধ্যে। ভাবতেও অবাক লাগে, কুরআনের এত গুরুত্বপূর্ণ ও অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য একটি বক্তব্য, কিভাবে বর্তমান মুসলিমদের চোখ এড়িয়ে (Overlook) গেল বা কিভাবে তারা এটিকে অগ্রাহ্য করল!

তাই সালাত নামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমলটি পালন করে বর্তমান বিশ্বের মুসলিমরা যদি দুনিয়া ও আখিরাতে কল্যাণ পেতে চায় তবে তাদেরকে অনুষ্ঠান সর্বস্ব করে সালাত পরিত্যাগ করে সালাতকে যথাযথভাবে কায়েম করতে হবে।

পুস্তিকায় কোন ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে আমাকে তা ধরিয়ে দেয়া সকল পাঠকের ঈমানী দায়িত্ব এবং আমার ঈমানী দায়িত্ব ভুল শুধরিয়ে পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো।

মহান আল্লাহ মুসলমান উম্মাহকে আবার সালাত কায়েম করার তৌফিক দান করুন- এ দোয়া করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ!

সমাপ্ত

লেখকের বইসমূহঃ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য
২. নবী রাসুল (আ.) কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁদের সঠিক অনুসরণের মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. আ'মল কবুলের শর্তসমূহ
৬. Common sense এর গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. ইসলামী আমলের গুরুত্বভিত্তিক অবস্থান জানার সহজ ও সঠিক উপায়
৯. ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কিনা?
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি
১২. ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. 'ঈমান থাকলেই বেহেশত পাওয়া যাবে' বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা
১৬. শাফায়াতের দ্বারা কবীরা গুনাহ ও দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?

১৭. 'তাকদীর পূর্ব নির্ধারিত'– কথাটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. হাদীসশাস্ত্র অনুযায়ী, সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে শিরক বা কুফরী নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ
২৩. অমুসলিম পরিবার বা সমাজে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কিনা?
২৪. 'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিকির-প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. কুরআনের অর্থ (তরজমা) ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. শিরক সবচেয়ে বড় গুনাহ-কথাটি কি সঠিক?
২৯. ইসলামী বক্তব্য,লেকচার বা ওয়াজ উপস্থাপনের ফর্মূলা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্ব মানবতার মূল জ্ঞানে ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. আল কুরআনে রহীত (মানসুখ) আয়াত আছে- প্রচলিত এ কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. ফিকাহ শাস্ত্রের সংস্করণ বের করা মুসলিম জাতির জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কী?

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (আরবী ও বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ (শুধু বাংলা)
৩. শতবার্তা
(পকেট কনিকা যাতে আছে উপরোল্লিখিত ৩৩টি বইয়ের মূল শিক্ষাসমূহ)
৪. কুরআনের ২০০ শব্দের অভিধান
(যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ)

প্রাপ্তিস্থানঃ

- ❑ কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
১১,শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরন, মগবাজার, ঢাকা। ফোন: ৯৩৪১১৫০, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭
- ❑ দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল, ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা। ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫
- ❑ আহসান পাবলিকেশন, ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোন:০২-৫৭১৬৪০৪৯
- ❑ আহসান পাবলিকেশন, কাটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স, কাটাবন মোড়, ঢাকা ০২৯৬৭০৬৮৬
- ❑ প্রফেসর বুক কর্ণার, ওয়্যারলেস রেলগেইট, মগবাজার, ঢাকা।
- ❑ সানজানা লাইব্রেরী, ১৫/৪ ব্লক সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর ঢাকা-১২০৭

- বিশ্বাস লাইব্রেরী, ৮/৯ বনশ্রী (মসজিদ মার্কেট)আইডিয়াল স্কলের পাশে
- Good World লাইব্রেরী, ৪০৭/এ খিলগাও চৌরাস্তা, ঢাকা-১২১৯
- আল ফারুক লাইব্রেরী, টঙ্গী বাজার, টঙ্গী, গাজীপুর।
- আইডিয়াল বুক সার্ভিস, মিরপুর-১০, ঢাকা।
- আজাদ বুক হাউস, আন্দরকিল্লাহ জামে মসজিদ কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম।
- সালেহিয়া লাইব্রেরী, হেলাতলা মসজিদ রোড, খুলনা।
- হেলাল বুক ডিপো, ভৈরব চত্বর, দড়াটানা, যশোর।
- আরাফাত লাইব্রেরী, আব্দুল ওয়াহেদ সুপার মার্কেট, মিশন স্কুলের সামনে,কুষ্টিয়া।
- এটসেটেরা বুক ব্যাংক, মাওলানা ভাষানী সড়ক, ঝিনাইদহ।
- কাটাবন বুক কর্ণার, কাটাবন মসজিদ কমপ্লেক্স, কাটাবন মোড়, ঢাকা।
- আমিন বুক সোসাইটি, আন্দরকিল্লা মসজিদ কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম।
- জামির কোচিং সেন্টার, ১৭/বি মালিবাগ চৌধুরী পাড়া, ঢাকা। মোবাইল:০১৯৭৩৬৯২৬৪৭

এছাড়াও অভিজাত লাইব্রেরীসমূহে পাওয়া যাচ্ছে।